দিয়াকে

আর

দিয়ার সবচেয়ে বন্ধু

লিজাকেও

নিবেদন

ছোটোদের জন্যে লেখা এই জীবনীর তথ্যগত অবলম্বন হিশেবে ব্যবহার করেছি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বেগম রোকেয়া-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ। তবে দু-একটি নতুন তথ্যও এখানে সংযোজিত হয়েছে। রোকেয়ার প্রথম প্রকাশিত লেখার তারিখ যে বৈশাখ ১৩০৯, প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী ফাল্গুন ১৩০৮ নয়, এ-কথাটাও এখানে জানিয়ে রাখি।

বাংলাদেশের রোকেয়া-গবেষকদের, এবং দুই বাংলা মিলিয়ে বেগম রোকেয়ার রচনা বিষয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল সেই অশোক উপাধ্যায়কে, আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

সুতপা ভট্টাচার্য

স্বপ্ন শুধুই মর্তে অমর

সূর্যের তাপ দিয়ে যে রান্না করা যায়, এখন আমরা সবাই তা জানি। গত শতাব্দীর শেষে বিজ্ঞানীরা সবে এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন। বিজ্ঞানী নন, এমন একজনও কিন্তু ও-রকম একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, পুরুষ নয়, মেয়েরাই উদ্ভাবন করছে সৌরচুল্লি। স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন, অবশ্যই তিনি পুরুষ নন। নাম তাঁর বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, আর তাঁর যে-লেখাতে এই স্বপ্নের কথা আছে, তার নাম 'সুলতানার স্বপ্ন'।

এই শতাব্দীর সূচনায়, আমাদের দেশের মেয়েরা যখন খুব অল্প কয়েকজনই লেখাপড়া শিখেছে, ঘরকন্নার বাইরে গিয়ে খোলা পৃথিবীতে কাজ করছে আরো অল্পজন, সে-রকম সময়ে 'সুলতানার স্বপ্ন'তে বলা হলো এক আজব রাজত্বের কথা। সে-রাজত্বে পুরুষেরা থাকে ঘরের কাজে, আর মেয়েরা করে আপিসের কাজ, রাজ্য চালানোর কাজ। পুরুষেরা ঘরে থাকে বলে সে-রাজ্যে খুনখারাপি চুরিডাকাতি কিচ্ছুটি হয় না—এসব কাজ সাধারণত ছেলেরাই করে কি না!

'সুলতানার স্বপ্ন' অবশ্য নিছকই স্বপ্ন। কিন্তু কেনই-বা এমন উলটো রাজত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন একজন? এ কথা তো ঠিক, সৌরচুল্লির আবিষ্কার কোনো মেয়ে করেনি। তবে কি এ-স্বপ্নের কোনো মানে নেই?

সকলেই এমন স্বপ্ন দেখেন না, একজন-দুজনই দেখেন। মানুষের

কষ্ট দেখে যাঁরা কষ্ট পান, তাঁরাই স্বপ্ন দেখেন এমন এক পৃথিবীর, যেখানে কেউ আর কষ্টে নেই। বেগম রোকেয়া ছিলেন এমনই একজন মানুষ। তাঁর বুকে বেজেছিল বিশেষ করে মেয়েদের কষ্ট।

মানুষের মধ্যে আধাআধি মেয়ে আধাআধি ছেলে। কোন্ আদিযুগ থেকে এমন একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে—মেয়েরা থাকবে ছেলেদের অধীনে। ছেলেরা যা বলবে, তাদের সেইভাবে চলতে হবে। তাদেরই হাতে ধর্ম, তাদেরই হাতে সমাজ। ধর্মের আর সমাজের নিয়ম তৈরি করে তারা মেয়েদের বেঁধেছে। সেই বাঁধনের দাগ কেটে কেটে বসে গেছে মেয়েদের মনে। মেয়েরা ধরেই নিয়েছিল ঘরসংসারের কাজ ছাড়া আর কিছুই তাদের করবার নেই।

রোকেয়া মেয়েদের মন থেকে সেই বাঁধনের দাগ মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। সেই ইচ্ছে থেকেই তাঁর যত কিছু লেখা, যত কিছু কাজ। 'সুলতানার স্বপ্ন' কিংবা 'পদ্মরাগ'-এর মতো লেখায় যেমন তাঁর এই প্রয়াস, তেমনই, সেই প্রয়াস থেকেই জন্ম নিয়েছে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' কিংবা 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিনে-ইসলাম'-এর মতো প্রতিষ্ঠান। এ কথা ঠিক, তাঁর কাজ ছিল বিশেষভাবে মুসলমান মেয়েদের মধ্যেই। কিন্তু তাঁর ভাবনায় ছিল সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের মেয়েদের চোখের জল মুছিয়ে দেবার আকুলতা। মেয়েদের জন্যে তাঁর ভালোবাসার মধ্যে বয়সের শ্রেণীর সম্প্রদায়ের কোনো ভেদ ছিল না। বাংলা ভাষাতে আর কেউ তাঁর মতন এমন অবিরাম ভালোবাসা দিয়ে মেয়েদের দুঃখের কথা, সে-দুঃখ দূর করার পথের কথা, বলেননি।

সজ্জিত লজ্জার খাঁচা

আজ থেকে একশো বছরেরও বেশ কিছুটা আগেকার বাংলাদেশ। তার উত্তরদিকের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রাম—সেই গ্রামে ছিল এক সম্ভ্রান্ত জমিদারবংশের শেষ জমিদারের মস্ত বড়ো বাগানে-ঘেরা বাড়ি। জমিদারের নাম জহিরুদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবের। চারজন স্ত্রী ছিল তাঁর। প্রথম স্ত্রীর নাম রাহাতুন্নেসা চৌধুরী, তাঁর পাঁচটি সন্তানের মধ্যে চতুর্থ জন হলেন রোকেয়া। ডাক নাম রকু। জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্ম হলো রোকেয়ার। মস্ত প্রাসাদে বাস, বাগানের গাছগাছালি থেকে সারাদিন ধরে কত কত পাখির ডাক, বাগানের মধ্যে আবার মস্ত এক পুকুর, পরিচর্যার জন্য রয়েছে কত পরিচারিকার দল।

তবে কি রোকেয়ার ছোটোবেলা খালি মজার, কেবলই আনন্দের ছোটোবেলা? কী করে তা হবে! সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের মেয়ে যে! তাকে যে ছোট্ট থেকেই পর্দা মানতে হয়। এমন পর্দার কথা এখনকার কালের মেয়েরা ভাবতেই পারে না! শুধু যে ছেলেদের সামনে বেরোনো মানা তা তো নয়, পরিবারের বাইরে মেয়েদের সামনেও বেরোনো চলবে না। প্রতিবেশী মহিলারা কেউ বেড়াতে এলে বড়োরা চোখের ইশারা করেন, আর ছোট্ট রকু অমনি প্রাণভয়ে ছুটে বেড়ায়, কখনো-বা রান্নাঘরের ঝাঁপের

পিছনে, কখনো-বা পরিচারিকাদের ব্যবহারের জন্য রাখা জড়ানো পাটির ভিতরে আশ্রয় নিতে হয় তাকে।

পাঁচ বছর বয়সে একবার তার মায়ের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিল রকু। কলকাতার বাসায় একদিন তার ছোটোবৌদির বাড়ি থেকে দুজন পরিচারিকা এল। পাছে তারা রকুকে দেখে ফেলে, সারা বাড়ি প্রাণ হাতে নিয়ে তাকে লুকিয়ে বেড়াতে হলো —কখনো কবাটের পাশে, কখনো টেবিলের তলায়। শেষে তাকে রেখে আসা হলো তিনতলার চিলেকোঠায়। সেই পরিচারিকারা যে-কদিন থাকল, রকুকে সারাদিন বন্দী থাকতে হলো সেই চিলেকোঠায়। সেখানে তাকে খেতে দিতেও বাড়ির লোকদের মনে থাকত না সবসময়।

বন্দী থাকার এই কষ্ট নিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছেন রোকেয়া। অবাক হয়ে তিনি দেখেছেন, মেয়েরা কীরকম সহজভাবে মেনে নেয় এই অর্থহীন অবরোধ! এতটাই তারা মেনে নিয়েছে যে ঘরে আগুন লাগলে তারা পুড়ে মরবে, তবু বাইরে পুরুষ থাকলে প্রাণ-রক্ষার জন্যেও বাইরে বেরোবে না। অনেক পরে তাঁর 'অবরোধ-বাসিনী' বইতে রোকেয়া এ-রকম কিছু সত্যিকারের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সেসব পড়লে হাসিও পায়, আবার চোখে জলও আসে!

বারণ-না-মানা আগ্রহ

একে তো এই উদ্‌ভুতুড়ে পর্দাপ্রথার দাপট, তার থেকেও যা সহ্য করা কষ্টের, তা হলো লেখাপড়া শেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা।

মেয়েরা যদি নেহাৎই কোনো ভাষা শেখে, তবে শিখতে পারে আরবি,—কোরান পড়বার জন্যে আরবি শেখাটা দরকারি। ফারসি বা উর্দু শেখাতেও বারণ নেই, কেননা সেসব ভাষা হলো খানদানি মুসলমানের ভাষা। কিন্তু বাংলা? সে তো সাধারণ মানুষের ভাষা, খানদানি মুসলমান বাড়ির মেয়ে সে-ভাষা কেন শিখবে? আর ইংরেজি ভাষা শেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। সে তো বিদেশীর ভাষা, কাজের জগতের ভাষা! মেয়েরা কি বাইরে বেরোবে নাকি যে ইংরেজি শিখবে?

সাবের পরিবারের মেয়েদের বাড়িতে আরবি শেখার ব্যবস্থা ছিল ঠিকই, কিন্তু বাংলা বা ইংরেজি পড়তে চাইলে নিন্দের বান ছুটত। তবু যদি সেসব ভাষা শেখার খুব ইচ্ছে হয় কারো, সে কী করবে? রোকেয়ার দিদি করিমুন্নেসা মাটিতে দাগ কেটে কেটে বর্ণমালা শিখে ফেলেছিলেন। বাংলা পড়তেও শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়। লুকিয়ে লুকিয়ে বটতলার পুঁথি পড়ছিলেন একদিন, ধরা পড়ে গেলেন বাবার কাছে। বকুনির ভয়ে আধমরা মেয়েকে বাবা কিন্তু বকলেন না। বরং নিজেই তাকে পড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আত্মীয়দের কড়া সমালোচনা। বাবা বাধ্য হলেন মেয়ের পড়া বন্ধ করে দিতে।

বিয়ের পরে স্বামীর সাহায্যে করিমুন্নেসা অবশ্য লেখাপড়া শিখেছিলেন অনেকটাই। ভালো কবিতা লিখতেন তিনি। রোকেয়াকে বাংলা বর্ণপরিচয় তিনিই করিয়েছিলেন। বড়ো হয়ে বিয়ের পরে বাংলা ভাষার পরিবেশ ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিলেন রোকেয়া, স্বামীও ছিলেন অবাঙালি। কিন্তু তাঁর দিদির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার গুণেই বাংলার চর্চা করে চলেছিলেন তিনি আজীবন। পরে, যখন তিনি মেয়েদের ইস্কুল তৈরি করলেন, সেখানেও উর্দু ভাষী ছাত্রী শিক্ষিকা পরিচারিকার সঙ্গে দিনভর উর্দু বললেও বাংলা কিন্তু তিনি ভোলেননি। আর তার জন্যে তাঁর ঐ দিদির প্রতিই তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

পরিবারের নিষেধ না মেনে রোকেয়াকে বাংলা শিখিয়েছিলেন দিদি করিমুন্নেসা, পরিবারের নিষেধ না মেনে রোকেয়াকে ইংরেজি শেখালেন বড়ো দাদা ইব্রাহিম সাবের। রোকেয়ার দুই দাদার যখন কম বয়স, রংপুরে তখন সিভিল সার্জেন ছিলেন শ্রীঅরবিন্দর বাবা, ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ। এঁর সাহচর্য পেয়েছিলেন সাবেররা দু-ভাই। ইংরেজিশিক্ষা কীভাবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা খুলে দেয়, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা। তাঁদের ইচ্ছে-মতো রোকেয়ার বাবা ছেলেদের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার ব্যবস্থা করে দেন। তাদের থাকবার জন্যে তালতলায় বাসা ভাড়া করেন।

পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পেলেন ইব্রাহিম সাবের। সে-আলো থেকে তাঁর বোন যে বঞ্চিত, তার দুঃখ তাঁর বুকে বাজল। মেয়ে বলে ইংরেজি শেখা মানা তার — সমাজের এই অর্থহীন

নিয়মের প্রতিবাদ করলেন। ইংরেজিতে লেখা ছবিওয়ালা একটি বই রোকেয়ার সামনে খুলে ধরে তিনি বললেন: 'বোন, এই ইংরেজি ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস, তবে পৃথিবীর এক রত্নভাণ্ডারের দরজা তোর কাছে খুলে যাবে।'

অনেক যত্নে অনেক ধৈর্যে ছোটো বোনটিকে ইংরেজি শেখাতে শুরু করলেন দাদা। রোকেয়ারও আগ্রহের শেষ নেই। দিনের মধ্যে কতবার যে দাদাকে পড়া জিজ্ঞেস করেন! তাঁর মা বিরক্ত হতেন ছেলের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে ভেবে। দাদা কিন্তু কখনো বিরক্ত হননি। বোনকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে দাদাকে লোকে কম সমালোচনা করেনি। কিন্তু ইব্রাহিম সাবের লোকের কথায় কান দেবার মানুষ ছিলেন না। সারাদিনের কাজ আর নিজের পড়া-শোনা সারা হলে রাত্রিবেলা বোনকে নিয়ে পড়াতে বসতেন দাদা। পড়াতে পড়াতে অনেক রাত হয়ে যেত। শুতে যেতে দেরি হতো অনেক, তাই উঠতেও দেরি হতো। সূর্যোদয়ের আগের নামাজ পড়া বাদ পড়ে যেত তাই কোনো কোনো দিন। আত্মীয়দের নিন্দাবাদ তাতে প্রখর হয়ে উঠত আরো। তাঁরা বলতেন— লেখাপড়া শেখার এই তো ফল! কিন্তু সে-নিন্দাবাদ শুনে দাদা পিছুপা হননি, উৎসাহ একটুও কমেনি তাঁর।

তাঁদের পরিবার নিয়ে গাথা রচনা করেছিলেন রোকেয়ার এক বৈমাত্রেয় ভাই, তাতে আছে:

ঐ নীতির পক্ষপাতী ছিল না ইব্রাহিম সাবের
বিজাতির ভাষা তিনি শিখালেন নিজ ভগ্নীদের

ইব্রাহিম আসাদ চলে এই সমাজে বিপরীত
ভগ্নীদের শিক্ষা দিয়ে মেয়েশিক্ষার করল চলিত।

রোকেয়ার বিয়ের পরে, যখন তিনি তাঁর দাদার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন, তখনো দাদার শিক্ষাদান চলেছিল চিঠির মাধ্যমে। শেখবার জন্যেই রোকেয়া চিঠি লিখতেন ইংরেজিতে, দাদা তাঁর ভাষা শুদ্ধ করে ফেরৎ পাঠাতেন। সাধে কি আর রোকেয়া তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ' দাদাকে উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'আমি আশৈশব তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না, —পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়, —আমি কেবল তোমাকেই জানি। জননী সময়ে সময়ে শাসন করিয়াছেন, —তুমি কখনও শাসন কর নাই। তাই মাতৃস্নেহের কোমলতাও তোমাতেই অনুভব করিয়াছি।'

এমন স্নেহময় দাদা পেয়েছিলেন বলেই ইস্কুল-কলেজে না যেতে পারলেও রোকেয়া সত্যিকারের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হননি। রোকেয়ার অন্য আত্মীয়স্বজনরা তাঁর শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, বরং নানাভাবে তাঁকে বিদ্রূপ করতেন, উপহাস করতেন। রোকেয়া সহ্য করেছেন সব। তাতে তাঁর শিক্ষালাভের জেদ আরো বেড়েছে বরং, কমেনি। তিনি যে তাঁর চারপাশে অশিক্ষিতা মেয়েদের কুসংস্কারের অন্ধকারে ঢাকা জীবন-ছবি অহরহই দেখছিলেন। মেয়েদের মনোহীনতা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল। সেই জড়ের জীবনকে প্রত্যাখ্যান কবার মন নিয়েই জন্মেছিলেন তিনি।

যুগল জীবনের জোয়ার জলে

দাদার স্নেহশিক্ষায় ছোট্ট রকু আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে উঠল। কিন্তু দাদা তো আর বোনটিকে চিরদিন কাছে রাখতে পারবে না, পরের ঘরে তো তাকে যেতেই হবে একদিন। কোথায় পাওয়া যাবে এমন ঘর, যে-ঘরে রোকেয়ার মতো মেয়ের বুদ্ধি রুচি আর শিক্ষা ঠিক ঠিক জায়গা পাবে—এই নিয়ে চিন্তা ছিল দাদার। পাওয়াও গেল তেমন ঘর।

পাত্রের যদিও বয়স অনেকটাই বেশি, আর বাঙালিও নন তিনি। আগে একবার বিয়েও হয়েছিল তাঁর, মেয়েও আছে একটি। স্ত্রী যদিও বেঁচে নেই আর। বিয়ে যখন হয়, তখন রোকেয়ার বয়স ষোলো, আর বরের বয়স আটত্রিশ। এমন অসমবয়স বর-কনে হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়ে কিন্তু রোকেয়ার জীবনে আশীর্বাদ হয়েই দেখা দিয়েছিল। পায়রাবন্দের উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন রোকেয়া, বাইরের খোলা পৃথিবীর হাওয়া লাগল গায়ে। ওড়িশায় বিহারে কত জায়গায় ঘুরলেন তিনি স্বামীর সঙ্গে, জীবনের কত বিচিত্র রূপ দেখা হলো!

রোকেয়ার স্বামীর নাম সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেন। রোকেয়ার যে-বছর জন্ম হয়, সেই বছরই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েছিলেন। যে-সময়ে তাঁর বিয়ে হয় রোকেয়ার সঙ্গে, সে-সময়ে তিনি ছিলেন ওড়িশার কণিকা স্টেটের ম্যানেজার। অভিজাত বংশের মেধাবী এই মানুষটি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে লেখাপড়া

শিখেছেন, সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিদেশেও ঘুরে এসেছেন। বিহারের মানুষ হলেও তিনি পড়েছিলেন হুগলি কলেজে, সেখানে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দুই বন্ধু পরস্পরের ভাষা শেখারও চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা ততটা শিখে উঠতে না পারলেও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল তাঁর।

মুকুন্দদেবের লেখা থেকে সাখাওয়াতের বিষয়ে অনেকটাই জানা যায়। খুব বড়ো পদে কাজ করলেও তাঁর চালচলন ছিল শাদাসিধে। যথেষ্ট উপার্জন থাকলেও খুব জাঁকজমকের জীবন-যাপন তাঁর পছন্দের ছিল না, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ফলিয়ে নতুন করে বাড়িও বানাননি তিনি, সাবেক আমলের মাটির বাড়িকেই নতুন করে নিয়েছিলেন। রোকেয়ার জন্যে তিনি একটি আটকোণা সুন্দর ঘর করে দিয়েছিলেন।

ঘরটিকে মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন রোকেয়া। সুন্দর করে গৃহস্থালির কাজ করতে ভালোই বাসতেন রোকেয়া, ভালো-বাসতেন সাখাওয়াতের বন্ধুবান্ধবকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে। কিন্তু তাঁর দাম্পত্য জীবন তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সাখাওয়াতের মতন একজন মানুষের সংস্পর্শে এসে রোকেয়ার জানবার একান্ত আগ্রহ যেন ঠিক-ঠিক পরিবেশটি পেল। ইংরেজি ভাষার চর্চায় স্বামীর সহযোগিতা পেয়ে তিনি এতটাই উন্নতি করতে পেরেছিলেন যে স্বামীর সরকারি কাজেও তিনি সাহায্য করতে পারতেন। সাখাওয়াৎ সাহেবের কাছে যেসব ইংরেজি

চিঠিপত্র আসত, রোকেয়াকে সেসব পড়তে দিতেন তিনি। উত্তর মুখে-মুখে বলতেন, লিখে নিতেন রোকেয়া। ইংরেজি অনেক বই, সাময়িকপত্র, রোকেয়াকে পড়তে দিতেন তিনি। এইভাবে ইংরেজি পড়া আর লেখা—তুইই খুব ভালোভাবে রপ্ত হলো রোকেয়ার। দাদার কাছে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি, স্বামীর সহযোগিতা পেয়ে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারল।

একবার, ভাগলপুরের বাঁকা সাবডিভিশনে তখন ছিলেন তাঁরা, সাখাওয়াৎ সাহেব বাইরে গিয়েছেন আপিসের কাজে, রোকেয়া বাসায় একা। স্বামী নেই, তাই করবার কিছুই নেই; সময় কাটাবার জন্যে ইংরেজিতে একটা মনগড়া কাহিনী লিখতে বসলেন তিনি। তুদিন পরে স্বামী ফিরে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যখন, এই তুদিন তিনি কীভাবে সময় কাটিয়েছেন, তখন রোকেয়া তাঁর হাতে তুলে দিলেন 'Sultana's Dream'।

এ-লেখা পড়ে রোকেয়ার স্বামী কিন্তু রাগ করতেও পারতেন, যদি তাঁর মনটা তেমন ছোটো হতো। পুরুষদের নিয়ে তো কম ঠাট্টা করা হয়নি সে-লেখাতে। কিন্তু সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেন সে-লেখা পড়ে মন্তব্য করেছিলেন : 'এ এক নিদারুণ প্রতিশোধ।' ভাগলপুরের কমিশনার ম্যাকফার্‌শন্‌-এর কাছে তিনি পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজি শুদ্ধ করে দেবার জন্যে। ম্যাকফার্‌শন্‌কে নাকি কলম ছোঁয়াতেই হয়নি, রোকেয়ার নিখুঁত সুন্দর ইংরেজির আর মৌলিক ভাবনার তারিফ করেছিলেন তিনি। এই লেখা, আর রোকেয়ার অন্যান্য লেখাও যে সাময়িক পত্রে ছাপা

হতে পারল, রোকেয়া যে সাহিত্যিক হিশেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারলেন, সে তাঁর স্বামীর আগ্রহ আর সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলেই। তাঁর স্বামী তাঁকে উর্দু ভাষাতেও তালিম দিয়েছিলেন, যার ফলে উর্দু কাহিনীরও অনুবাদ করতে পেরেছেন রোকেয়া।

জীবনে দু-দুবার মা হয়েছিলেন রোকেয়া। কিন্তু প্রথম মেয়েটির পাঁচ মাস বয়সে আর দ্বিতীয় মেয়েটির চার মাস বয়সে মৃত্যু হয়। সন্তানহীন এই দম্পতি দুজনে দুজনের ভাবনা-চিন্তার ভাগ নিয়েই সময় কাটাতেন তারপর।

রোকেয়া ছিলেন তাঁর স্বামীর গর্বের বিষয়। অন্যের কাছে তিনি রোকেয়ার গুণের কথা বলতেন। এ কথা জানা যায় 'মহিলা'-পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র সেনকে লেখা হামিদা দেবীর একটি চিঠি থেকে। 'মহিলা' পত্রিকায় হামিদা দেবীর একটি লেখা পড়ে ভালো লেগেছিল বলে রোকেয়া লেখাটির প্রশংসা করে গিরিশচন্দ্র সেনকে চিঠি লেখেন। 'হামিদা দেবী' নাম দেখে রোকেয়া ধরে নিয়েছিলেন ইনি একজন মুসলমান কন্যা। হামিদা অবশ্য মুসলমান ঘরের মেয়ে ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে। রোকেয়া তাঁর লেখার প্রশংসা করেছেন—গিরিশচন্দ্র সে-কথা হামিদাকে জানালে উত্তরে তিনি যে চিঠি দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রকে (২ ডিসেম্বর ১৯০৫), তাতে ছিল : 'Mrs Hosain-কে আমি চিনি, তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি, কথাবার্ত্তা অনেক তাঁহার সহিত হইয়াছে, কিন্তু নাম পরিচয় তিনি হয়তো আমার জানেন না। Mr Hosain-এর সহিত আমার যথেষ্ট জানাশোনা আছে। তিনি

Mrs Hosain-এর জীবনের কত কথা আমাদের নিকট গল্প করিয়াছেন। মেয়েটি সত্যই বড় ভালো। ইচ্ছা হয় তাঁহার দ্বারা মোসলমান নারীগণের কিছু উন্নতির পথ খুলিয়া যায়।' তাঁর এই ইচ্ছা যে পূর্ণ হয়েছিল, তা অবশ্য জেনে যাননি হামিদা, এ চিঠি লেখার অল্প দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

একই ইচ্ছা ছিল নিশ্চয়ই সাখাওয়াৎ সাহেবেরও। তাই না তিনি তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকে দশ হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছিলেন, যা দিয়ে রোকেয়া মুসলমান মেয়েদের জন্যে একটি ইস্কুল খুলতে পারেন। শরীরে কিছু কিছু অসুখ ছিল তাঁর, সম্ভবত তিনি জানতেন যে বেশি দিন বাঁচবেন না। তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোটো তাঁর স্ত্রী কী নিয়ে দিন কাটাবেন তাঁর মৃত্যুর পর? এই নিয়ে চিন্তা করেছিলেন তিনি। রোকেয়ার ভাবনার ভাগ তিনি নিতেন বলেই তিনি বুঝেছিলেন মেয়েদের শিক্ষা দেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই রোকেয়া সবচেয়ে খুশি হবেন।

মৃত্যুর আগে বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন সাখাওয়াৎ। দীর্ঘদিন ধরে রোকেয়া তাঁর সবটুকু সময় দিয়ে স্বামীর সেবা করেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলেন সাখাওয়াৎ। রোকেয়া সে-সময় বই পড়ে শুনিয়ে তাঁকে যতটা সম্ভব ভালো রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর রোগশয্যার দিনগুলির স্মৃতি রোকেয়া ভুলতে পারেননি কোনোদিন। জীবনের শেষ দিকে একটি চিঠিতে দুঃখ করে লিখেছিলেন: 'বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ urine পরীক্ষা করেছি। পথ্য

বেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি।' তাঁর এই আক্ষেপ থেকেও বোঝা যায় নিজের গৃহকোণটিতে কতটা অসামান্যা ছিলেন তিনি। এমনতর শুশ্রূষা করবার ক্ষমতা, একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা আর মমতার জন্যেই যা সম্ভব, কজন মানুষেরই বা থাকে ?

তাঁর বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে রোকেয়ার ওই আক্ষেপই অবশ্য শেষ কথা নয়। ১৯০৯ সালের মার্চ মাসে সাখাওয়াৎ সাহেবের মৃত্যু হয়। তার অনেক বছর পরে, ১৯২৭ সালে, তার দিদির কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন রোকেয়া 'তিনি [দিদি] উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।' তাঁর স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাও কখনো ভোলেননি রোকেয়া। ১৯১৯ সালে লেখা একটি চিঠিতে রোকেয়া জানিয়েছিলেন তাঁর স্বামী তাঁকে বলে গেছেন ধর্ম বিষয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা না করতে। রোকেয়ার মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে, 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'-এর নাম পরিবর্তন করতে যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সরকার, রোকেয়া তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে বলেছিলেন : 'আমি আমার স্বামীর নামের কাঙাল নই। কারণ আমি জানি তাঁর সত্যিকার স্মৃতি আমার সাথেই রয়েছে ও আমার সাথেই লুপ্ত হয়ে যাবে।'

না, লুপ্ত হয়ে যায়নি। রোকেয়ার চিরস্মরণীয় নামের সঙ্গে তাঁর স্বামীর নামও থেকে যাবে চিরস্মরণীয়।

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়

মাত্র চোদ্দ বছরের দাম্পত্যজীবন রোকেয়ার, তারও মধ্যে শেষ দু-বছর সাখাওয়াৎ রোগশয্যাতেই ছিলেন। বাকি সময়টুকুতে রোকেয়া কীভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ রোকেয়ার সাহিত্যসৃষ্টি। সাখাওয়াতের রোগশয্যায় থাকার সময়—১৯০৮-৯ কালপর্বে রোকেয়ার কোনো লেখা প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে তাঁর প্রধান রচনাগুলির অধিকাংশই প্রকাশ পেয়ে গেছে। তাঁর দুটি প্রবন্ধ-সংকলনের মধ্যে প্রথমটির — 'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধগুলি সবই এই সময়পর্বে নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, আর 'মতিচূর' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। ১৯০৫ সালেই Indian Ladies Magazine পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'Sultana's Dream'। আর তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ'-এর প্রাথমিক খশড়া সম্ভবত ১৯০২ সালে লেখা হয়। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে, কিন্তু ভূমিকায় রোকেয়া জানিয়েছিলেন তার বাইশ বছর আগেই বইটি প্রথম লিখেছিলেন তিনি।

স্বামীর অসুস্থতা, স্বামীর মৃত্যু, ইস্কুল প্রতিষ্ঠা, মায়ের মৃত্যু, আত্মীয়দের দুর্ব্যবহার—এই সবকিছু মিলিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা বেশ কিছুদিন বন্ধ হয়ে যায়। ছয় বছর পর আবার তাঁর লেখা প্রকাশ হতে থাকে নানান কাগজে। ১৯২১ সালে তাঁর দ্বিতীয়

প্রবন্ধের বই 'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় আর ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় 'অবরোধবাসিনী'।

মাত্র তো এই পাঁচটি বই, আর তার বাইরে ছড়ানো-ছিটোনো আরো কিছু বাংলা-ইংরেজি লেখা। একবার ইংরেজি কবিতা লেখার প্রতিযোগিতাতে প্রথম হয়েছিলেন, কিন্তু কবিতাটি ছাপেননি কোথাও। তাঁর প্রকাশিত লেখার পরিমাণ খুবই অল্প। কিন্তু শুধু সেইটুকুরই জন্যে, তাঁর জীবন-নিংড়ানো কাজের ক্ষেত্র যদি বাদও দিই, শুধু তাঁর লেখারই জন্য তিনি চিরস্মরণীয় তবু। তিনি তো শুধু শিল্পের জন্যে শিল্প করেননি, সব সময়ই তাঁর লেখাতে রয়েছে কোনো-না-কোনো বিষয়ে বলবার কথা, ভাববার কথা — ধর্ম, দেশ, সমাজ, শিক্ষা — যে-কোনো বিষয়েই ছিল তাঁর জোরালো বক্তব্য, আর জোরালো ভাবে তা প্রকাশ করতেও তিনি জানতেন। তার মানে অবশ্য গলা-ফাটানো বক্তৃতার স্বর নয়, তাঁর স্বর হলো রঙ্গ-রসিকতার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের। ঠিক যেমনভাবে কথা বলতেন তিনি, ছড়া কেটে প্রবাদ বলে, খুব দুঃখের সময়ও ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে, তেমনিই তাঁর লেখা। আবার কত রকমের ভঙ্গি তাঁর লেখায়, কখনো রূপকথার ভঙ্গি, কখনো সংলাপের ভঙ্গি, কখনো গল্পের ভঙ্গি, কখনো নকশার। এই জন্যেই-না তিনি যা বলতে চান, তা এমন করে বুকে গিয়ে বেঁধে !

কী তিনি বলতে চান, দেখা যাক এক এক করে। প্রথমে ধরা যাক ধর্ম বিষয়ে তাঁর মত। ধর্মের আধ্যাত্মিক দিককে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন চিরদিন। কিন্তু ধর্মের নাম দিয়ে যেসব সামাজিক

আইন-কানুন আছে, যা দিয়ে পুরুষপ্রধান সমাজ মেয়েদের উপর নিষ্ঠুরতম অত্যাচার করতে পারে, যেমন, একাদশীর দিন জল না ছুঁতে দিয়ে শিশুকন্যার জীবন নিতে পারে,—রোকেয়ার প্রতিবাদ ছিল তার বিরুদ্ধে। 'মুনিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী-মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন' —রোকেয়ার এ-কথা কে বলবে ভুল! ধর্মের এ-রকম নিষ্ঠুর আইনেব বিরুদ্ধে কথা বললেই কেউ অধার্মিক হয়ে যান না— সে তাঁদের শত্রুরা যাই বলুন না কেন।

অভিজাত মুসলমান ঘরের মেয়ে, অভিজাত মুসলমান ঘরের বধূ রোকেয়া যে কতদূর ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তা তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায়। ইসলাম ধর্মের উপর অসীম শ্রদ্ধা ছিল তাঁর, তবে সে-ধর্মের ব্যাখা করতেন তিনি নিজের মনের আলো দিয়ে। সে-ব্যাখ্যা কতটা জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে, তার দৃষ্টান্ত 'দজ্জাল' নামে লেখাটি। বাংলা অনুবাদে 'কেয়ামত-নামা' পড়ে লেখাটি লেখেন তিনি। ক্ষণিক সুখের লোভে যে স্বর্গের পথ ত্যাগ করে অভিশপ্ত হয়, শাস্ত্রমতে সেই হলো 'দজ্জাল'। রোকেয়া দেখেছেন সংসারে যারা শ্রেয়র পথ ত্যাগ করে প্রেয়কে গ্রহণ করে তারই হয় দজ্জালের দশা। আর 'পোলসেরাত' নামে যে অতি সূক্ষ্ম দুরূহ আঁকাবাঁকা সেতু অতিক্রম করে তবে স্বর্গলাভ সম্ভব হয়, তারও একটা ভাবব্যঞ্জনা দিয়েছেন রোকেয়া। তাঁর কাছে এই সংসারেই প্রতি মানুষের আছে পরীক্ষাক্ষেত্র—সেই তার 'পোলসেরাত'। 'এই ভারতের ত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্যে কয়জন লোক প্রতিদিন

ছুই বেলা পূর্ণোদর আহার প্রাপ্ত হয়? কয়জন লোকের জন্য জীবিকার পথ সুগম? কয়জন পোলসেরাতের উপর বসিয়া অশ্রুপাত না করে? কয়জন জীবনের এক একটি দিনকে এক বৎসর তুল্য দীর্ঘ মনে না করে?'

ইসলাম ধর্ম মেয়েদের যত সম্মান দিয়েছে, তা আর কোনো ধর্ম দেয়নি—এ কথা রোকেয়া বারবার বলেছেন। কিন্তু মুসলমান-সমাজের পুরুষপ্রভুরা তাঁদের মনের মতো বিধান দিয়ে চলেছেন—এই ছিল রোকেয়ার অভিযোগ। ধর্মের নামে মুসলমান-সমাজ কীভাবে ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, তার একটি তীব্র সমালোচনা রোকেয়ার 'রসনা-পূজা' প্রবন্ধটি। রমজান মাসে মুসলমান-সমাজ সংযমের নামে কীভাবে খাওয়া-দাওয়ার ধুম লাগায় তাকেই বিদ্রূপ করেছেন রোকেয়া সে-লেখায়। ধর্মনিষ্ঠ হয়েও তাই রোকেয়াকে ধর্মান্ধ বলা যাবে না কোনোমতে। রোকেয়া তাই ঈদ-উৎসবে হিন্দুদেরও যোগ দেবার আশা রেখেছিলেন: 'ঈদের দিন হিন্দু-ভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি ছুরাশা? সমুদয় বঙ্গবাসী একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি?'

অ-মুসলমান গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর 'ধর্মসাধন নীতি' নামে বইটিতে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। চিঠির আকারে রোকেয়া বইটির একটি সমালোচনা লেখেন 'মহিলা' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩১৯)। এ বই পড়ে খুশি হয়েছিলেন রোকেয়া, কেননা: 'আমরা আপনার বিষয়ে ততোধিক চমৎকৃত হই···আপনি মোসলমান ধর্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি যে ভাষায় লিখেন, তাহা ভক্তের ভাষা—

কূট সমালোচনার ভাষা নহে। সহজেই বুঝা যায় যে, আপনি পাদ্রীদের ন্যায় আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় বিধি বিধানের ছিদ্রান্বেষণে বদ্ধপরিকর নহেন। এজন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।' অনেকে মনে করেন ইসলাম ধর্মে গান জিনিসটা নিষেধ। রোকেয়ার শিল্পীমন স্বভাবতই সংগীতপ্রিয়, আর ইসলাম ধর্মও তাঁর প্রাণ। গিরিশচন্দ্র দেখিয়েছিলেন কোরানে গানমাত্রই যে মানা এমন নয়, যেটা বারণ তা হলো সংগীতের নামে অশ্লীলতা। রোকেয়া তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছিলেন : '…এই কথা লিখিয়া আপনি আমাদিগকে "সঙ্গীতবিরোধী" দুর্নাম হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস যে মোসলমান ধর্মটা বড় কটখটে—কারণ সঙ্গীত হেন মধুর বস্তুটি উহাতে নিষিদ্ধ। এখন আর বোধ হয় কেহ আমাদিগকে সঙ্গীতবিরোধী মনে করিবেন না।' রোকেয়া যে সত্যিকারের ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু এতটুকু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না অর্থাৎ ধর্মকে কেবল একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে মনে করতেন না, এই লেখাটি পড়লে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

রোকেয়ার ভাইবোনেদের আর রোকেয়ার স্বামীর মধ্যে কোনো সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা কুসংস্কারের প্রতাপ এতটুকুও ছিল না। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী বন্ধু সাখাওয়াতের উদার মনের কথা বলে গেছেন। রোকেয়ার বড়ো দিদি করিমুন্নেসার বড়ো ছেলে আবদুল করিম আবু আহমদ খান গজনভী বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। যেসব সভায় তাঁর সদস্যপদ ছিল, তার কোনোটিই কোনো সাম্প্রদায়িক সভা নয়। মুসলমান-

সমাজের অল্প কয়েকজন নেতাই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। ইনি তাঁদেরই মধ্যে একজন। তাঁর ছোটোভাই আবদুল হালিম হুসাইল খান গজনভীও বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বিশ বছর ধরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন তিনি। রোকেয়ার ছোটো বোন হোমায়েরা, যিনি রোকেয়ার শিক্ষাদান-ব্রতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সারা জীবন, তাঁর একমাত্র ছেলে আমির হোসেন চৌধুরী নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, ১৯৬৪ সালে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উৎপীড়িত মানুষকে উদ্ধার করার কাজ করতে গিয়ে। আর রোকেয়ার বড়ো দাদা, যিনি তাঁর শিক্ষাগুরু, তাঁর ধর্মভাবনা বোঝা যায় তাঁর একটি গল্প থেকে। 'পদ্মরাগ' উপন্যাস শুরু হবার আগে 'নিবেদন' অংশে পাওয়া যাবে সেই গল্পটি :

> আজি মনে পড়ে, আমার ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন ; সমস্ত গল্পটি মনে নাই, এইটুকুই কেবল স্মরণ হয় :
>
> একজন ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তি জনৈক দরবেশের নিকট যোগশিক্ষা করিতে চাহিল। তাহাতে দরবেশ বলিলেন, 'চল আমার গুরুর নিকট।' সে গুরু একজন হিন্দু। হিন্দু সাধু বলিলেন, 'আমি কি শিখাইব, আমার গুরুর নিকট চল।' তাঁহার গুরু আবার একজন মুসলমান দরবেশ !! শিক্ষার্থী দরবেশকে এই হিন্দু-মুসলমানে মিশামিশির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন : ধর্ম একটি ত্রিতল অট্টালিকার ন্যায়। নীচের তলে অনেক কামরা, হিন্দু—ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা, মুসলমান—শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানা

> সম্প্রদায় ; ঐরূপ খ্রীস্টান,—রোমান-ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট ইত্যাদি। তাহার উপরে দ্বিতলে দেখ, কেবল মুসলমান,—সবই মুসলমান, হিন্দু সবই হিন্দু, ইত্যাদি। তাহার উপর ত্রিতলে উঠিয়া দেখ,—একটি কক্ষ-মাত্র, কামরা বিভাগ নাই, অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু, কিছুই নাই—সকলে একপ্রকার মানুষ এবং উপাস্য কেবল এক আল্লাহ। সূক্ষ্মভাবে ধরিতে গেলে কিছুই থাকে না—সব 'নাই' হইয়া কেবল আল্লাহ থাকেন।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের ভূমিকায় রোকেয়া এ-গল্পটি কেন যে উদ্ধৃত করলেন, তা কিন্তু আর লেখেননি তিনি। ধর্ম নিয়ে কোনো সমস্যার কথা তো নেই এ উপন্যাসে! এক 'তারিণী-সদন'কে ঘিরে এ উপন্যাসের ঘটনা ঘটছে, যে-সদনে নিরাশ্রয় উৎপীড়িত মেয়েরা আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায়, স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসের নায়িকা এমন একজন মেয়ে, যার নিজের উপর আস্থা আছে, যার সাহস আছে, বুদ্ধি আছে আর শিক্ষাও আছে। সেই মেয়ের জবানিতে এ উপন্যাসে রোকেয়া এইটেই বলতে চেয়েছেন যে মেয়েরা মাটির পুতুল নয়, তাদের যখন ইচ্ছে প্রত্যাখ্যান, আবার যখন ইচ্ছে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু শুধু হয়তো এইটেই নয়, আরো কিছু বলতে চাইছেন রোকেয়া, আর তারই জন্যে শুরুতে দিয়েছেন ঐ গল্পটি। সব ধর্মেরই শেষ কথা একই—এ কথা আছে গল্পে, আর উপন্যাসে আছে সব ধর্মসম্প্রদায়ের মেয়েদের অবস্থা একই। হিন্দু, মুসলমান কিংবা খ্রিষ্টান—যে ধর্মসমাজেরই মেয়ে হোক, পুরুষ তার উপর যে অবিচার-অত্যাচার করে, তার ধরণের বিশেষ হেরফের নেই। তারিণী-সদনে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তারা

কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রিষ্টান, কিন্তু সকলের চোখের জলের ভাষা একই, সকলেই তারা সকলের বন্ধু।

সব ধর্মেই মেয়েদের উপর অত্যাচারের ধরণটা যে একই— সে-কথা রোকেয়ার অন্য লেখাতেও রয়েছে। 'অবরোধবাসিনী' বইতে হিন্দু আর মুসলমান—দুই সমাজের মেয়েদেরই অবরোধপ্রথার হাস্যকর বাড়াবাড়ির ছবি তুলে ধরেছেন রোকেয়া। সে-সময় অনেকে মনে করতেন, ভারতেই শুধু বুঝি মেয়েদের এত কষ্ট, ইওরোপের মেয়েরা কত সুখী! কিন্তু রোকেয়া সে-ভুল করেননি। 'ডেলিসিয়া হত্যা' নামে একটি লেখাতে মেরি করেলির লেখা ইংরেজি উপন্যাসের কাহিনী বাংলায় তিনি শুনিয়েছেন, তার শুরুতে লিখছেন : 'ইংরাজ রমণীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি তাহারা স্বাধীন, বিদুষী, পুরুষের সমকক্ষা, সমাজে আদৃতা—তাঁহাদের আরও কত কি সুখ সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্তি মানস নয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর।' ইওরোপের মেয়ে 'স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুরে বন্দিনী নহেন', আর ভারতের মেয়ে 'পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অবরোধে বন্দিনী'। পরিস্থিতির এত ফারাক থাকলে কী হবে, 'উভয়ে অবলা! উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্মপীড়িতা।' কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা খুব বড়ো তফাৎ এই যে ইওরোপের মেয়ে বিদুষী, আর ভারতের মেয়ে নিরক্ষর। তাই ইওরোপের মেয়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আছে, যা ভারতের মেয়ের নেই!

এই যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে মেয়েদের কষ্টের কথা বলতে পেরেছেন রোকেয়া, এইখানে তাঁর কোনো জুড়ি নেই। তাঁর রচনার অনেক আগেই মেয়েদের জীবনযাপনের হীনতার কথা বলছিলেন অনেক মহিলাই, যেমন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই বলেছেন কৈলাসবাসিনী দেবী, কিন্তু তাঁর বই এর নাম ছিল 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'—সে তো নিছক হিন্দু-সমাজেরই ছবি। কিংবা ধরা যাক উনিশ শতকের শেষ দিকে কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা, মেয়েরা যে পুরুষের থেকে নিচুস্তরের কোনো জীব নয়—এই কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি, মেয়েদের স্বনির্ভর হবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তাঁর লেখায় 'স্ত্রীলোক' একটি বিশিষ্ট ধারণা। মেয়েদের পরিস্থিতি তিনি বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে বুঝেছেন। কিন্তু রোকেয়ার লেখায় যুক্তি থাকলেও মূল কথা হলো হৃদয়।

কোনো নৈর্ব্যক্তিক 'স্ত্রীলোক' নয়, তাঁর অধিকাংশ লেখায় রোকেয়া দেখেছেন বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ একটি মেয়েকে। ধরা যাক 'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের 'গৃহ' নামে লেখাটির কথা। সে-লেখার অনেক পরে একজন ইংরেজ লেখিকা, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, বলেছিলেন যে লিখতে হলে মেয়েদের একটা নিজস্ব ঘর চাই। আর 'গৃহ' প্রবন্ধে রোকেয়া দেখিয়েছেন বাঁচতে হলে যে-ঘরটুকু দরকার মানুষের, অনেক মেয়ের সেটুকু অবলম্বনও নেই। তারা তাদের বাবার কিংবা স্বামীর কিংবা ভাই-এর বাড়িতে থাকে। আইন তাদের সম্পত্তিতে অধিকার দিলেও পুরুষপ্রধান সমাজের

দাপট তাদের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে। কারা তারা? তারা হয় রমাসুন্দরী, নয় খদিজা; হয় সৌদামিনী, নয় মোহ্‌সেনা। এইভাবে যে-কোনো সম্প্রদায়ের একটি একটি করে অনেক মেয়ের দুর্ভাগা জীবনকথা শুনিয়েই রোকেয়া বলতে পারেন: 'গৃহ বলিতে আমাদের একটিও পর্ণকুটির নাই। প্রাণী-জগতে কোনো জন্তুই আমাদের মতো নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে, নাই কেবল আমাদের।' দুঃখী মেয়েদের সঙ্গে রোকেয়া নিজেকে এইভাবে মিলিয়ে নেন, মিলিয়ে নেন ভালোবাসায়।

'প্রেম-রহস্য' নামে তাঁর একটি লেখায় ষাট বছর বয়স্ক তাহেরার মুখ দিয়ে রোকেয়া বলান: 'আমি হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান—সকল ধর্মাবলম্বীকেই ভালবাসিয়াছি। আমি বালিকা, প্রৌঢ়া, প্রাচীনা—সকল বয়সের লোকই ভালবাসিয়াছি। কিন্তু কেন ভালবাসিয়াছি তাহা আমি আজি পর্য্যন্ত বুঝি নাই।' রোকেয়া ছাড়া আর কেই-বা তখন 'স্ত্রীলোক' না বলে শুধু 'লোক' শব্দ ব্যবহার করতেন। লেখাটির মধ্যে তিনটি ভালোবাসার গল্প বলেছেন তাহেরা: একটি চাঁড়াল বালিকা, একজন মুসলমান বেগমসাহেবা আর একটি খ্রিষ্টান মহিলা—তিনজনেরই নিবিড় ভালোবাসা পেয়েছেন তাহেরা। চাঁড়াল মেয়েটির সঙ্গে তাহেরার দেখা ওড়িশায়, মুসলমান বেগমসাহেবার সঙ্গে পশ্চিমের কোনো শহরে। রোকেয়া তাঁর স্বামীর সঙ্গে প্রথমে ওড়িশায়, পরে পশ্চিমের ভাগলপুর শহরেই তো বাস করেছেন। 'প্রেম-রহস্য' লেখাতে যে-প্রেমের কথা আছে, যে-'প্রেমের আদি অন্ত নাই'—সে-প্রেম

মেয়েদের প্রতি এক মেয়ের প্রেম। রোকেয়ার এই প্রেম তাঁর দেশের সব মেয়েদের প্রতি। সেই প্রেমিক মন নিয়ে তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশা দেখেছেন, বলেছেন তার কথা। 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি'-র এক সভায় (১৯২৭) তিনি ছিলেন সভানেত্রী, সে-বক্তৃতার মধ্যে এক জায়গায় বলেছিলেন :

> ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন ? সে জীব ভারত-নারী। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন ; স্বয়ং থার্ডক্লাস গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র রেল-পথিকদের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র 'পশু-ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি' দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে, তাহার জন্য এংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূ-ভারতে নাই।

তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে

মেয়েদের কষ্ট এমন ভাবেই দেখেছেন রোকেয়া। কিন্তু শুধুই মেয়েদের নয়, সব দুঃখী মানুষের জন্যেই মন কেঁদেছে তাঁর।

ওড়িশার কণিকা স্টেটে বেশ উঁচু পদে কাজ করতেন তাঁর স্বামী। স্বামীর সঙ্গে রোকেয়াও ছিলেন সেখানে। তিনি লক্ষ করেছেন সেখানকার গরিব চাষিদের অবস্থা – পান্তা ভাতের সঙ্গে নুন ছাড়া কিছুই জুটত না তাদের। শুঁটকি মাছ তাদের কাছে ভীষণ দামি এক খাবার। সমুদ্রের ধারে গ্রাম, নাম সাতভায়া, সেখানকার লোকেরা ভাতের সঙ্গে নুনটুকুও জোগাতে পারত না, সমুদ্রের জলে চাল ধুয়ে একটু নোনতা করে নিয়ে ভাত রাঁধত। তাঁর বাপের বাড়ি রংপুর জেলাতে রোকেয়া দেখেছেন চাষিরা এত গরিব যে প্রতিদিন ভাতটুকুও জোগাতে পারে না, পাটশাক লাউ-শাক সেদ্ধ করে পেট ভরায়। আর কী কাপড় পরে তারা? মেয়েদের জন্যে তারা কষ্টেসৃষ্টে জোগাড় করে আটহাতি কাপড়, কিন্তু নিজেরা থাকে কৌপীন পরে। আর শোয় তারা খড়ের বিছানায়।

চাষির দুঃখ এভাবে বুঝেছিলেন বলেই তিনি কলকাতা শহরের চকঝমককেই দেশের উন্নতি বলে ভুল করেননি। দেশে কলকারখানা হয়েছে, চটকলের কর্মচারীরা পাঁচশো-সাতশো টাকা বেতন পায় – তাকেই কি বলব দেশের উন্নতি? চটকলের কাঁচামাল পাট উৎপাদন করে যারা, কই, তাদের অবস্থা তো বিন্দুমাত্র উন্নত হয়নি? 'আল্লাহতালা এত অবিচার কিরূপে সহ্য করিতেছেন?'—

গভীর আক্ষেপে প্রশ্ন করেছেন রোকেয়া। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে অনেকদিন বিহারের নানা অঞ্চলে ঘুরেছেন, বিহারের বড়োলোকের বাড়ির মেয়েদের ভয়ানক অবরোধ-প্রথার ছবি তো তিনি নানা জায়গায় বলেছেনই, বিহারের চাষির ঘরের মেয়ের দুর্দশাও তাঁর চোখ এড়ায়নি — সেখানে দু-সের খেসারিডালের জন্যে বৌ মেয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে চাষি — এমন খবরও দিয়েছেন তিনি।

মানুষ নিয়েই তো দেশ। মানুষকে যিনি ভালোবাসেন, দেশকে যে তিনি ভালোবাসবেন, এ তো স্বাভাবিক কথা। বিশেষ করে বিশ শতকের সেই গোড়ার দিকে, রোকেয়ার সেই যৌবনকালে, বাংলা দেশের উপর আছড়ে পড়ছে স্বাধীনতা-আন্দোলনের জোয়ার। প্রথমে — বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, পরে যা বয়কট আন্দোলনে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। তারপর গান্ধীজির অসহ-যোগ আন্দোলন, চরকা আন্দোলন — একের পর এক ঢেউ উঠছে আর পড়ছে। রোকেয়ার মতো সজাগ মনের মেয়ের পক্ষে সম্ভবই নয় এসব আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন থাকা। কিন্তু কী তিনি করতে পারেন? তাঁর পরিবার কিছুটা ব্যতিক্রম হলেও সাধারণ-ভাবে মুসলমান-সমাজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে তখন ততটা বিচলিত নয়। সেখানে মেয়ে হয়ে, পদস্থ রাজকর্মচারীর পর্দানশিন স্ত্রী হয়ে তিনি আর কী-বা করতে পারেন?

কিন্তু কেনই-বা পারবেন না? তাঁর হাতে যে আছে কলম। সুগৃহিণীর কী কর্তব্য তাই নিয়ে তাঁর আগে অনেক মেয়ে লিখে গেছেন, যাঁদের মধ্যে আছেন ঠাকুরবাড়ির আধুনিকা বধূ

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও—তাঁরা বলেছেন সন্তানপালন, রোগীর সেবা, গৃহসজ্জা—এই জাতীয় কর্তব্যের কথা। কিন্তু 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে রোকেয়া সুগৃহিণীর এমন কর্তব্যের কথা লিখলেন, যা তখনকার অন্য লেখিকারা ভাবতেও পারতেন না। তিনি লিখলেন :

> আদর্শ গৃহিণীর প্রতিবেশিনীর বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করা উচিত। আর প্রতিবেশীর পরিধি বৃহৎ হওয়া চাই—অর্থাৎ প্রতিবেশী বলিলে যেন কেবল আমাদের দ্বারস্থিত গৃহস্থ না বুঝায়। বঙ্গদেশের প্রতিবেশী বলিতে পাঞ্জাব, অযোধ্যা, উড়িষ্যা—এ সবই যেন বুঝায়। হইতে পারে পাঞ্জাবের একজন ভদ্রলোক কোন কারখানায় কাজ করেন, সেই কারখানার কর্তৃপক্ষকে তাঁহারা বিশেষ কোনো অভাবের বিষয় জানাইতে বারবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ ধর্মঘটকে যেন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজের লোকে নিজেদের কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ ভাবিয়া আহ্লাদিত না হন। সুগৃহিণী আপন পতিপুত্রকে তাদৃশ ধর্মঘট স্থলে কার্যগ্রহণে বাধা দিবেন। আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসী বা খ্রীষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি—আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী—তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন।

১৯০৫ সালেই প্রকাশিত হয়ে গেছে 'মতিচুর' প্রথম খণ্ড, যাতে এই 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধটি আছে। ধরে নেওয়া যায় ১৯০৪ সালে লেখা হয়েছে প্রবন্ধটি। এই সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যে ধর্মঘটের পথ নেবার কথা কজনই বা আর জানত, আর

নিজেকে ভারতবাসী হিশেবে ভাবতই বা কজন। রোকেয়া ভাবছেন এসব, আর চাইছেন, সব মেয়েই তা ভাবুক, ভাবাক!

হ্যাঁ, মেয়েরা। মেয়েরা না যোগ দিলে দেশের দুঃখ দূর করার কাজ কি সফল হতে পারে কখনো? রোকেয়া এ-রকমই ভাবতেন। আর সেই ভাবনাই তিনি প্রকাশ করেছেন দুটি রূপ-কথার রূপক দিয়ে, যার একটির নাম 'মুক্তিফল', অন্যটি 'জ্ঞানফল'।

কংগ্রেসের মধ্যে ১৯০৫ সাল থেকেই চরমপন্থী আর নরমপন্থীর যে বিরোধ শুরু হয়, তা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯০৭ সালে সুরাটের অধিবেশনে—মারামারি হাতাহাতির মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ভেঙে যায়। সেই ঘটনার পরই রোকেয়া লিখেছিলেন 'মুক্তিফল' নামে রূপকটি। দেশের স্বাধীনতাই এই রূপকের 'মুক্তিফল'। আর কাঙালিনী নামে এক অসুস্থ মা, যিনি দেশজননীর রূপক। কাঙালিনীর ছেলেরা কেউ কেউ মুক্তিফল এনে দিতে চায়, যা খেলে মায়ের অসুখ সারবে, কেউ বা আদৌ দৃকপাত করে না মায়ের দুঃখে, আর যারা এনে দিতে চায় তারাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। শেষে কাঙালিনীর ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও বেরিয়ে পড়ল মুক্তিফল আনতে, তখন আশ্বাস পেল কাঙালিনী—এইখানেই শেষ হয়েছে এই গল্প। ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে মেয়েরাও যতদিন না যোগ দিচ্ছে স্বাধীনতা-সংগ্রামে, ততদিন সে-সংগ্রাম সফল হবার নয়—এই ছিল রোকেয়ার বিশ্বাস।

'জ্ঞানফল' রূপকটি ইংরেজের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী, তার অর্থনৈতিক শোষণ সবটুকুই শুনিয়েছেন রোকেয়া।

সেই শোষণের প্রতিবাদ করতে শিখবে আমাদের দেশের মানুষ সেইদিন, যেদিন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এদের সকলে জ্ঞানলাভ করবে। অসাধারণ কৌশলে জিনপরী কনকদ্বীপের রূপকের মধ্য দিয়ে উপনিবেশকদের আসল চেহারাটা দেখিয়েছেন রোকেয়া। এই লেখাটি ছাপা হয়েছিল ১৯০৭ সালে, যখন সাধারণ মানুষ রাজভক্ত, অল্পলোকই যখন জানে রাজশক্তির পিছনকার দেশশোষণের তত্ত্ব।

১৯২১ সালে, ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে অসহযোগিতা করবার জন্যে যখন ডাক দিচ্ছেন গান্ধীজি, তখন দেশকে স্বনির্ভরতার পথে নিয়ে যাবার একটা প্রতীক হিশেবে সবাইকে চরকা কাটতেও নির্দেশ দিচ্ছেন। গ্রামগুলি কীভাবে আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, কীভাবে দেশের মানুষ ভোগ্যপণ্য হিশেবে দেশের উৎপাদনই গ্রহণ করবে, এইসব নিয়ে গান্ধীজির ভাবনাচিন্তা ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়। রোকেয়ার সঙ্গে গান্ধীজির আন্দোলনের কিংবা কোনো রকমের রাজনৈতিক আন্দোলনেরই কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু গান্ধীজির বাণী তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

নিজের মতো করে গ্রামের উন্নতির কথা ভেবেছিলেন রোকেয়া। রংপুর তাঁর দেশ। রংপুরে একসময় এণ্ডির কাপড় তৈরি হতো। এণ্ডির গুটির চাষ হতো ঘরে ঘরে। মেয়েরা চলতে-ফিরতে তকলিতে গুটি থেকে সুতো বার করত। তাঁতিরা সেই সুতো দিয়ে কাপড় বুনত। কিন্তু ইংরেজরা এসে আমাদের নিজস্ব কুটিরশিল্প সব কিছুই নষ্ট করে দিয়েছিল। এখান থেকে এণ্ডি কিনে নিয়ে গিয়ে নিজের দেশ থেকে কাপড় তৈরি করে এনে আমাদের বাজারে বিক্রি করত

তারা। রংপুরের এণ্ডিশিল্পকে আবার নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন রোকেয়া তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। তার জন্যে ছমাস ধরে রংপুরের কয়েকজন ভদ্রলোককে চিঠি লিখে লিখে বিরক্ত করে রোকেয়া একটিমাত্র গ্রামের কথা জেনেছিলেন যেখানে এণ্ডিশিল্পকে বজায় রাখার চেষ্টা চলছিল। বেলকা নামে সেই স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ছাত্রদের মধ্যে তাঁতের ক্লাস খুলেছিলেন, সে তাঁতে এণ্ডির কাপড় বোনা হতো। কিন্তু সুতো পাবার অসুবিধে ছিল সেখানে। সুতো পেতে গেলে তো এণ্ডির গুটি চাষ করতে হবে। রোকেয়া তাঁর 'এণ্ডিশিল্প' নামে লেখাটিতে এণ্ডির গুটি কী করে পুষতে হয় তার নিয়ম দিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যবসাতে কত লাভ হতে পারে তারও বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন তিনি। বিদেশীবর্জনের রাজনৈতিক স্লোগানে গলা না মিলিয়ে, হাতে-কলমে স্বদেশী শিল্পকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবার উপায় নিজের মতো করে ভেবেছেন রোকেয়া। গান্ধীজির খদ্দরের ডাক, চরকায় সুতো-কাটার ডাক কিছু কিছু বাঙালি গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই, গান্ধীজিকে অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু রোকেয়া চলেছিলেন নিজের পথে।

অবশ্য, গান্ধীজি প্রবর্তিত চরকা-আন্দোলনও ছায়া ফেলেছে রোকেয়ার রচনায়। 'বলিগর্ত' নামে একটি নকশায় দেখি হিন্দু মেয়ে আর মুসলমান মেয়ে মিলেমিশে চরকা প্রচারের কাজ করছে। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের কথাও এসেছে রোকেয়ার লেখায় —'সৃষ্টি-তত্ত্ব' নামে একটি নকশায় কৌতুক করে লিখছেন তিনি :

'কতকগুলি যুবক "সত্যাগ্রহ" ব্রত লইয়া মাতিয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, "সত্যাগ্রহ" ছাড়িয়া "মিথ্যাগ্রহণ" কর।...তাঁহারা "মিথ্যা-গ্রহণ"-এর বিরুদ্ধে সত্যপ্রচার প্রয়াসে লেকচার দিয়া দিয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বেড়ান।'

কংগ্রেস আন্দোলনের পাশাপাশি দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও চলছিল। সন্ত্রাসবাদের আদর্শ বিষয়ে নীরব থাকলেও একজন সন্ত্রাসবাদীর উদ্দেশে কবিতা লিখে বিপ্লবী দেশভক্তদের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন রোকেয়া। বিপ্লবী কানাইলালের ফাঁসির আদেশ শোনবার পর রোকেয়া লিখেছিলেন :

বিচারক বলে, 'কানাই তোমার
গলায় পড়িবে ফাঁসি।'
শুনি শ্যামলাল বেপরোয়া ভাবে
হাসিল ঘৃণার হাসি।
রাখিতে পরের পরাণ যে জন
দেয় নিজ বলিদান,
সে কি বিচলিত ফাঁসির আদেশে ?
মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞান। (নিরুপম বীর)

কিন্তু দেশের সব মানুষই তো আর স্বাধীনতা নিয়ে ভাবিত ছিল না, একদল আবার বিদেশী প্রভুর পায়ে লুটিয়ে থেকে বড়ো বড়ো খেতাব পেয়ে যেত। এদের রোকেয়া বিদ্রূপ করতে ভোলেননি। 'নিরীহ বাঙালী' প্রবন্ধে তালিকা দিচ্ছেন রোকেয়া—কী কী কাজ বাঙালি সহজে পারে, তার মধ্যে একটি হলো : 'অল্পবিস্তর অর্থব্যয়ে

দেশে কোনো মহৎ কার্যদ্বারা খ্যাতিলাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভ জন্য অর্থব্যয় করা সহজ।' এই খেতাব রোকেয়ার ভাষায় 'লাঙ্গুল'। আর যখন ইংরেজ সরকার বললেন যারা প্রতিবাদ-টতিবাদ করে না, তাদেরও খেতাব কেড়ে নেবেন, তখন রোকেয়া বিদ্রূপ করে কবিতা লিখলেন :

প্রাণে মরি সেও ভাল,
শতবার মৃত্যু ভাল,
লাঙ্গুলবিরহ কিন্তু সহিতে না পারি।...
'বোবার অরাতি নাই'
এই সত্য জানি তাই
নীরব ছিলাম মোরা ল্যাজ-প্রাপ্তগণ।
এ কি শুনি অকস্মাৎ
বিনা মেঘে বজ্রপাত—
মৌন দোষে হবে নাকি লাঙ্গুলকর্তন। (আপিল)

শুধু লেখার মধ্যে দিয়ে নয় অবশ্য, কাজের মধ্যে দিয়েও রোকেয়ার দেশচেতনার পরিচয় পাই—সে-কাজ হলো মুসলমান নারী-সমাজের মধ্যে দেশভাবনার প্রসার ঘটানো। ১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল, এসেছিলেন অ্যানি বেসান্ত্—সেই উপলক্ষে যে স্বেচ্ছাসেবিকা দল তৈরি হয়েছিল, রোকেয়ার প্রয়াসে তার মধ্যে অনেক মুসলমান মেয়েও যোগ দেয়। অসহযোগ কিংবা খিলাফত আন্দোলন সম্বন্ধে রোকেয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুসলমান নারী-সমিতিকে সচেতন করে তুলেছিলেন, সেসব আন্দোলনকে সে-সমিতি সাহায্যও করেছে।

জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী

বিদ্রূপই রোকেয়ার লেখার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। ভালোবাসার উলটো পিঠই যে রাগ। রোকেয়ার ভালোবাসা যেমন প্রবল, তাঁর রাগও তেমনি প্রবল। একজন সমালোচক তাঁর লেখা পড়ে বলেছিলেন : 'সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজদেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের কোনো ক্ষতি কিংবা অভাব পূরণ হয় না। "মতিচূর"-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন।' এই মন্তব্য পড়ে বোঝা যায় অনড় সমাজ-শরীরে চাবুকের মারের জ্বালা একটু তবে ধরিয়েছিলেন রোকেয়া! সেটা কি কম বড়ো কাজ?

তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'পিপাসা'র মূলে ছিল গভীর কোনো শোক, ছাপা হয়েছিল 'নবপ্রভা' নামে একটি পত্রিকায় (১৩০৯ বৈশাখ)। সেখানে লেখিকার একটি পরিচিতি ছিল এইরকম : 'এই প্রবন্ধটি একটি ভদ্র সম্ভ্রান্ত মুসলমান রমণী কর্তৃক লিখিত। ইনি একজন বিলাত-প্রত্যাগত, মুসলমান রাজকর্মচারীর পত্নী। লেখিকা বাঙ্গালা, ইংরাজি, আরব্য ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্না। এই প্রবন্ধটি বিনা সাহায্যে স্বাবলম্বনে লিখিয়াছেন। সুললিত, সুমিষ্ট, গৌরবপূর্ণ বঙ্গভাষা আজ অসূর্যম্পশ্যা মুসলমান কুলবালাকে আকৃষ্ট এবং হিন্দুত্বে পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছে,

ইহা কম আহ্লাদের বিষয় নহে। লেখিকার এই প্রথম উদ্যম। আশা হয় বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে তিনি অধিকতর শোভা পাইবেন।'

এই 'নবপ্রভা' কাগজের সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দাদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। তাঁর আশা যে কতদূর সার্থক হয়েছিল তা সম্ভবত তিনি 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের প্রথম খশড়া পড়ে বুঝেছিলেন। রোকেয়া জানিয়েছেন তাঁর পাণ্ডুলিপির মার্জিনে তিনি 'beautiful', 'most beautiful' মন্তব্য করেছিলেন।

তবে রোকেয়ার কলমে বঙ্গভাষা নিছক 'সুললিত, সুমিষ্ট' থাকল না, তাতে তীব্র বিদ্যুৎও ঝলসে উঠল কোথাও কোথাও। জ্ঞানেন্দ্রলালের 'হিন্দুত্বে পরিস্ফুট'—এই কথায় বোঝা যায়, সে-সময় মুসলমান-সমাজে সম্ভবত বাংলা ভাষার চর্চাই ছিল 'হিন্দুত্ব-চর্চা'। বাংলাভাষার চর্চা করবেন কিনা, এ বিষয়ে তখনো শতাব্দীর সেই শুরুতে, বাঙালি মুসলমান ঠিক যেন মনস্থির করে উঠতে পারেননি।

রোকেয়া যাঁদের ভালোবাসেন, তাঁদেরই তিনি জাগাতে চান, আর তাই, তাঁদের প্রতিই তাঁর ব্যঙ্গ। তাঁর ব্যঙ্গ বাঙালির প্রতি, তাঁর ব্যঙ্গ মুসলমানের প্রতি, তাঁর ব্যঙ্গ। মেয়েদের প্রতি। আর পুরুষের প্রতি ব্যঙ্গ বললে কম বলা হয়, তাকে বলা যায় কশাঘাত। বাঙালিদের প্রতি বিদ্রূপের একটা নমুনা শোনা যাক :

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়—পাশ বিক্রয়। এই পাশবিক্রেতাদের নাম 'বর' এবং ক্রেতাকে 'শ্বশুর' বলে। এক-একটি পাশের মূল্য কত জান? 'অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকুমারী'। এম. এ. পাশ অমূল্য রত্ন, ইহা যে সে

ক্রেতার ক্রেয় নহে। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কিনা, তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ।

'তিন কুড়ে' নামে লেখাটিতে আছে বাঙালি মুসলমানকে বিদ্রূপ :

শুনতে পাই, বাঙ্গালা মুল্লুকে নাকি প্রায় পৌণে তিন কোটি মুসলমানের বাস। এঁরা সেই তিন কুড়ে—নড়াচড়া, চলাফেরা কিছু করেন না, কেবল কুম্ভকর্ণের মত শুয়ে শুয়ে ঘুম পাড়েন। গত এপ্রিল মাসে যখন কলকাতায়—তথা সারা বাঙ্গালায় দাঙ্গা হাঙ্গামার আগুন ভীষণ বেগে জলে উঠল, তখন যেখানে যত নকল 'কুড়ে' ছিল, তারা সবাই গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠে উন্নতির চেষ্টায় লেগে গেল, কিন্তু আমরা তিন কোটি কুড়ে সেই পূর্বের মতই পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছি। 'স্যার' অমুক দয়া করে দু'চারটা চাকুরি জুটিয়ে দিবেন, শেঠ অমুক খয়রাত ফাণ্ড থেকে কিছু দান করবেন—তাতেই কোনো রকমে আমাদের দিন কেটে যাবে। তারপর গোনা দিন কয়টা শেষ হলে পরকালে বেহেস্ত তো আমাদের জন্য রিজার্ভ হয়ে আছে। সেখানে আমরা ছাড়া আর কে যাবে? চার দিনের দুনিয়া, ইহাকে চায় কে? কোন মতে ভবনদী পার হলেই অনন্ত-কালের জন্য অফুরন্ত বেহেস্ত আর অসংখ্য হুরী !!

মেয়েদের প্রতি বিদ্রূপ তো 'অবরোধবাসিনী'র পাতায় পাতায়, তবে সে-বিদ্রূপের তলায় তলায় আছে তাদের পুরুষ প্রভুদের প্রতি তীব্র শ্লেষ ! হজ করতে যাচ্ছে সম্ভ্রান্ত জমিদার বাড়ির মেয়েরা, কলকাতা স্টেশনে তাদের ওয়েটিংরুমে রাখা হলো না, পাছে কেউ দেখে ফেলে! তাদের প্ল্যাটফর্মের উপর বোরকা পরে উবু করে বসিয়ে তার উপরে মোটা শতরঞ্চি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো--এই না হলে

আর অবরোধ! ঘরে চোর এসেছে টের পেলে অবরোধের মেয়েরা কী করবে? তারা নিশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকবে, কেননা চোর যে বাইরের লোক—তাদের গলার শব্দ তো তাকে শোনানো যাবেই না—নিশ্বাসের শব্দও যেন তারা শুনতে না পায়। এক বাড়িতে মেয়ের বিয়ের সব গয়না নিয়ে চোর তো পালাল, চৌকিদাররা গিয়ে দেখে 'বিবি সাহেবা তখনও পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হন নাই—"যদি ব্যাটারা আবার আসে"—তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে যে!' মেয়েরা বিয়ের পর কেমন অর্ধাঙ্গী হয় তার এক মজার বিবরণ দিয়েছিলেন রোকেয়া :

> স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা-বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী যখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন।

শুধু ব্যঙ্গই নয় অবশ্য, তাঁর লেখায় সর্বত্রই ছিল তাঁর নিজস্ব রঙ্গপ্রবণতা, তাঁর সরস কথা বলার ধরণ। এমনি একটি নিরাবিল কৌতুক রচনা, 'নারী-সৃষ্টি'। এর মূল অংশটি যদিও ইংরেজি একটি রচনার অনুবাদ, কিন্তু তার সঙ্গে রোকেয়া নিজস্ব রসিকতাও জুড়ে দিয়েছেন। সেখানে আছে, সৃষ্টির দেবতা নাকি নানা জিনিস থেকে নানা উপাদান নিয়ে সেগুলো ভালো করে ফেটিয়ে তাই দিয়ে তৈরি করেছেন নারীকে। কেমন সেসব উপাদান?—তার

মধ্যে সাপের বক্রগতি কিংবা বাঘের নিষ্ঠুরতা যেমন আছে, তেমনি আছে ঘাসের কাঁপন কিংবা গোলাপের ক্ষীণতা; আখের রসের মিষ্টত্ব যেমন আছে, তেমনি আছে কুইনাইনের তিক্ততা; লবণের লাবণ্য যেমনি আছে, তেমনি আছে মরিচের ঝাল। মেয়ে-গুলো তো এইভাবে তৈরি হয়, আর ছেলেগুলো? ছেলে তৈরির সময়ে আর উপাদান থেকে ভাবটুকু ছেঁকে নেননি স্বষ্টিকর্তা, নিয়েছেন গোটা গোটা জিনিসগুলোই। সে-গল্প আছে 'স্বষ্টিতত্ত্ব' নামে নকশাতে: 'দন্ত নির্মাণের সময় সর্পের বিষদন্ত আমূল লইয়াছি, হস্ত-পদ-নখ প্রস্তুত করিতে শার্দূলের সমস্ত নখর লইয়াছি, মস্তিষ্কের কোষসমূহ (cells) পূর্ণ করিবার সময় গর্দভের গোটা মস্তিষ্কটাই ব্যবহার করিয়াছি। নারী স্বজনকালে আমি শুধু অনলের উত্তাপ লইয়াছিলাম। পুরুষের বেলায় একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়াছি।'

এ অবশ্য নিছক স্বপ্নকথা, তা স্বপ্ন ছাড়া আর সত্যি বলবার জায়গাই বা মেয়েদের কোথায়? 'সুলতানার স্বপ্ন'-ও তো স্বপ্ন-কথাই, স্বপ্ন বলেই সেখানে বন্যজন্তুর সঙ্গে পুরুষের তুলনা দিয়ে দেওয়া যায়! সুলতানা তো জানে দুর্বল বলে মেয়েরা অন্তঃপুরের বাইরে নিরাপদ নয়, কিন্তু সারা বলে: 'হ্যাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন,—যতদিন পুরুষ জাতি বাইরে থাকে। তা কোনো বন্য জন্তু কোনো একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও ত সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না।' সুলতানাকে দিব্যি বলতে পারে এই সারা: 'অশিক্ষিত অমার্জিত-রুচি পুরুষেরা বিনা শৃঙ্খলে থাকিবার উপযুক্ত নহে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিত

থাকেন ?' সারার দেশে তাই জেনানার বদলে আছে মর্দানা। কিন্তু এ-বইতে ছেলেদের নিয়ে রঙ্গ করা এইখানেই শেষ নয়। সারার দেশে মেয়েরাই তো আপিসের কাজটাজ করে, কিন্তু সেসব কাজ সারতে তাদের তুঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। তারপর তারা সেলাই-টেলাইও করে থাকে। সুলতানা শুনে অবাক হয়ে বলে : 'তুই ঘণ্টায় ! আপনি একি বলেন ?—তুই ঘণ্টায় আপনার কার্য শেষ হয় ! আমাদের দেশে রাজকর্মচারীগণ—যেমন ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রমুখ প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।' সারা তার ভুল ভেঙে দেয় : 'না প্রিয় সুলতানা। ইহা আপনার ভ্রম। তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন।...তাঁহারা মুখে যত বলেন, কাজে তত করেন না। রাজ-পুরুষেরা যদি কিছু করেন, তাহা এই যে, কেবল তাঁহাদের নিম্নতম কর্মচারীদের ছিদ্রান্বেষণ। মনে করুন একটি চুরুট ভস্মীভূত হইতে অর্ধঘণ্টা সময় লাগে, আর কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।'—এই তো হলো পুরুষদের সাংঘাতিক পরিশ্রমের নমুনা, যার অহংকারে বাড়ির মেয়েদের উপর সবসময় প্রভুত্ব ফলানো ! আর সেই প্রভুত্ব ফলানোর যোলো আনা হক তো সমাজ দিয়েই রেখেছে, বিবাহিত মেয়ে তার পুরুষটিকে তো 'স্বামী' 'পতি'—এসব বলেই চিহ্নিত করে ! কেন তা করতে হয় ? মেয়েরা যদি অর্ধাঙ্গী হয়, তবে ছেলেদের 'অর্ধাঙ্গ' বলে ডাকা হয় না কেন ?—তাঁর 'অর্ধাঙ্গী' নামে লেখাটিতে রোকেয়া এ প্রশ্ন তুলেছিলেন।

'সুলতানার স্বপ্ন'র মধ্যে মেয়েদের সামর্থ্যের উপর যে আস্থা প্রকাশ পেয়েছে রোকেয়ার, সে কিন্তু তাঁর সত্যিকারের আস্থা। পুরুষের শরীরের ক্ষমতা মেয়েদের থেকে বেশি, কিন্তু মানসিক ক্ষমতা মেয়েদেরই বেশি—সারার একথাগুলি তো রোকেয়ারই কথা। স্বপ্নে নয়, বাস্তবেই তাঁর বিশ্বাস ছিল নিশ্চিত : 'স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কেবল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অনেক ভাবে—অনেক যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনা চিন্তায়ই হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।' এই বিশ্বাস ছিল বলেই মেয়েদের দুর্দশার কথা বলে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটি করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। একটি লেখায় তিনি মানকুমারী বসুর কবিতা উদ্ধৃত করেছিলেন :

'কাঁদ তোরা অভাগিনী, আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি, ক'ফোঁটা নয়ন-বারি
ভগিনী ! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব।
যখন দেখিব চেয়ে' অনূঢ়া, 'প্রাচীনা মেয়ে'
কপালে যোটেনি বিয়ে—তখনি কাঁদিব।
যখন দেখিব বালা সহিছে সতিনী-জ্বালা
তখনি নয়ন-জলে বুক ভাসাইব।
সধবা বিধবা-প্রায় পরান্ন মাগিয়া খায়—
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব,
এ তুচ্ছ এ হীনপ্রাণ দিতে পারি বলিদান—
তোদের কল্যাণে, বোন ! কিন্তু কি করিব ?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।'

এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন রোকেয়া মানকুমারীর এই মানসিকতার সঙ্গে নিজের তফাত বোঝাতেই। এই কান্নার সুরে সুর মেলাতে রাজি নন রোকেয়া: 'আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি কেবল "কাঁদিয়া মরিতে" ব্যয় করিলেন! বাস! ঐরূপ বিজনে অশ্রু ঢালিয়াই ত আমরা এমন অবলা হইয়া পড়িয়াছি।'

এইখানেই রোকেয়া তাঁর সময়ের আর সকলের থেকে আলাদা। সরলা দেবী চৌধুরানীর মতো কোনো কোনো সাহসিকা বাঙালিকে বীরত্বের পথে আহ্বান করেছেন। কিন্তু মেয়েদের নিজের ভিতরকার শক্তিতে বীর্যবান হতে এমনভাবে ডাক দিয়েছেন একলা রোকেয়াই, ডাক দিয়েছেন হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে: 'ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন—অগ্রসর হউন। বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা জড়াউ অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ। আর কার্যতঃ দেখাও যে আমরা সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক।' রোকেয়া তাঁর রচনার মধ্যে বারবার নানাভাবে এ-কথাই বলতে চেয়েছেন যে মেয়েরা শুধু সুন্দর সুন্দর শাড়ি-গয়না পরে পুতুল সাজবার জন্যে জন্মায়নি, তারা বিশেষ কর্তব্য করবার জন্যে জন্মেছে; তারা শুধু পতিদেবতার মন ভোলাবার জন্যে নিজেকে দান করে দেবার জিনিস নয়। শুধু খেতে-পরতে পাবার জন্যে পরের গলগ্রহও যেন তারা কখনো না হয়।

দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন

তার জন্যে কী দরকার ? দরকার শিক্ষার। শিক্ষা থাকা-না-থাকায় কতই না তফাৎ। তাজমহল দেখে লোকে শাজাহানের শিল্পকীর্তির জয়ধ্বনি দেয়, কিন্তু তাজমহল যার কবর সেই মমতাজকে কে মনে রাখে ? আর নূরজাহান বেগমের স্মৃতিরক্ষার জন্যে কোনো সৌধ তৈরি করা হয়নি, তবু কিন্তু নূরজাহান চিরস্মরণীয়া। সে কী জিনিস, নূরজাহানকে যা অমর করেছে ? সে হলো শিক্ষা। তাজমহলকে কোনোদিন শত্রু কিংবা দৈবঘটনা ধ্বংস করে দিতে পারে, কিন্তু নূরজাহানের স্মৃতি মানুষের মনে থেকে যাবে। এইরকম ভেবেছিলেন রোকেয়া।

মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা সেসময় শুধু রোকেয়া একা নন, আরো অনেক লেখিকাই বলছিলেন। তখনকার মেয়েদের লেখালেখির প্রধান একটা বিষয়ই ছিল—স্ত্রী-শিক্ষা। তবে ব্রাহ্ম সমাজে তো বটেই, হিন্দু সমাজেও ততদিনে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা অনেকটাই এগিয়েছে। বিদ্যাসাগর মেয়েদের জন্যে বেশ কিছু ইস্কুল করেছিলেন গ্রামে গঞ্জে, কলকাতায় মেয়েদের জন্যে ছিল বেথুন স্কুল কিংবা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের মতন আরো কিছু উন্নতমানের ইস্কুল। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান ঘরের মেয়েরা সেসব ইস্কুলে পড়তে পারত না পর্দাপ্রথার জন্যে। সেই অবরোধ-বাসিনীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে শুধু লেখালিখি নয়—ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কাজে—এ তো সাখাওয়াৎ দম্পতি ঠিকই

করে রেখেছিলেন। কিন্তু তখন কি জানতেন তাঁরা কী কঠিন সেই কাজ? জানলেন যখন, তখনো মুহূর্তের জন্যে পিছু হটেননি রোকেয়া। 'দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন / কেন নাহি করি আহরণ / প্রাণ করি পণ' – এ কথাগুলি কি রোকেয়ার মতো মেয়ের কথা ভেবেই লেখেননি রবীন্দ্রনাথ?

তাঁর স্বামীর মৃত্যুর মাত্র পাঁচমাস পরেই শুরু হয়েছিল সেই কাজ – ভাগলপুরেই। স্বামী হারানোর শোক তখনও তাঁকে অভিভূত করে রেখেছে। ইস্কুল বিষয়ে ধারণাও নেই কোনো – নিজে তো ইস্কুলে পা দেবার সৌভাগ্য করেননি! এতটাই আনাড়ি ছিলেন যে, প্রথম পাঁচটি মেয়ে নিয়ে যখন ইস্কুল শুরু করেন, তখন তাঁর ভারি আশ্চর্য ঠেকেছিল যে একজন শিক্ষিকা একই সময়ে একসঙ্গে পাঁচজন মেয়েকে কী করে পড়াতে পারেন! রোকেয়া নিজে যে একা একাই পড়েছিলেন তাঁর দিদির কাছে কিংবা দাদার কাছে! ক্লাস-পড়ানো বিষয়ে এতটাই কম ধারণা নিয়ে আর শোকে দিশেহারা মন নিয়েও তিনি সাহস করে শুরু করে দিয়েছিলেন ইস্কুল – সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল – স্বামীর ইচ্ছাপূরণ, রোকেয়ার ব্রত!

সাখাওয়াৎ সাহেবের রেখে যাওয়া দশ হাজার টাকা তো ছিলই ইস্কুলের জন্যে। আর সে-যুগের দশহাজার টাকা সে তো অনেক টাকা। ইস্কুল করতে কোনো অসুবিধে হবার কথা ছিল না। কিন্তু রোকেয়াকে ভাগলপুরে টিঁকতেই দিলেন না সাখাওয়াৎ সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর কন্যা আর তার স্বামী। সাখাওয়াৎ যদিও

তাঁর কন্যা-জামাতাকে যথেষ্ট সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন তবু তাঁরা সম্পত্তি নিয়ে রোকেয়ার সঙ্গে অশান্তি করতে ছাড়লেন না। তাদের সঙ্গে বিবাদ চালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি হয়নি রোকেয়ার, তাই নিজের হাতে সাজানো ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে কলকাতার আশ্রয়হীনতার মধ্যে অনায়াসে চলে এলেন! এই সময় তাঁর সহায় ছিলেন ছোটো বোন হোমায়েরা। মিঃ আবদুল মালেক নামে ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি জানিয়ে ছিলেন। ১৯০৯-এর মে মাসে সাখাওয়াৎ হোসেনের মৃত্যু হয়, তারপর প্রায় একবছর চরম অশান্তিতে ভাগলপুরে থাকতে হয় রোকেয়াকে। ১৯১০ সালের শেষ দিকে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। যদিও কন্যা-জামাতার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি তিনি। কন্যার মৃত্যুর পরেও নাতনিদের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বিহারে গেছেন—এমন খবর তাঁর লেখা থেকে পাই।

কলকাতায় এসে ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনে বাড়ি ভাড়া নিলেন রোকেয়া। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সের একাকিনী মেয়ে, সে-যুগে কলকাতায় বাস করা সহজ ছিল না। তাঁর মাকে সেজন্য নিজের কাছে এনেছিলেন রোকেয়া। সেই বাড়িতেই, ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ আবার নতুন করে শুরু হলো ইস্কুল, মাত্র আটটি মেয়ে আর দুটি বেঞ্চি নিয়ে। ক'দিন পরে ২ এপ্রিল তারিখে আবদুল রসুলের বাড়িতে তৈরি হলো ইস্কুলের কমিটি। সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন মৌলভী সৈয়দ আহমদ আলী। ইস্কুল শুরু হবার খবর ছাপা হলো 'দি মুসলমান'-এ, অভিভাবকদের মেয়ে পাঠানোর

জন্যে আবেদন করা হলো, আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হলো কড়াভাবে পর্দাপ্রথা বহাল থাকবে ইস্কুলে।

অবশ্য শুধু ছাপা আবেদনের উপর ভরসা করে বসে থাকেননি রোকেয়া। মুসলমান পরিবারগুলিতে ছাত্রী-সংগ্রহের জন্যে নিজে তিনি যেতে শুরু করলেন। তাঁর ইস্কুলে মেয়ে পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করতেন তিনি। প্রত্যেকটি মেয়ে যাতে সুশিক্ষা পায় তার দায়িত্ব তিনি নিজে নেবেন—এমন প্রতিশ্রুতিও দিতেন। শুধু তাই নয়, এও তিনি জানিয়ে দিতেন যে পড়ার জন্যে কোনো বেতন দিতে হবে না, এমনকী, মেয়েদের ইস্কুলে যাতায়াতের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থাও তাঁর, আর তার জন্যেও অভিভাবককে ভাড়া গুনতে হবে না !

এতসব বলার জন্যেই বোধহয় অভিভাবকরা ধরে নিতেন তাঁদের মেয়েটিকে ইস্কুলে পাঠিয়েই তাঁরা ধন্য করে দিচ্ছেন রোকেয়াকে ! মানুষ নিজে যেমন, অন্যকেও তেমনই ভাবে। তারা নিজেরা যেহেতু স্বার্থ ছাড়া কোনো কাজ করে না, তাই অন্যের কাজেও স্বার্থের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়। যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্যে কাজ করতে চান—শুধু মানুষেরই ভালো চেয়ে, তাঁদের তাই এইসব মানুষ এত সমালোচনা করে। রোকেয়া কেন ইস্কুল করতে চাইছেন ? কেন, জানো না ? অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে ইস্কুল গড়ে নিজের রূপযৌবনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে ! মেয়ে হওয়া এত অপরাধের। মেয়ে বলেই না এমন নীচ অপমানজনক কথা বলতে পারে লোকে ! রোকেয়ার এই উদ্যমের মাত্র দশবছর আগে নতুন ধরণের

একটা ইস্কুল করেছিলেন একজন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাম—গ্রামীণ পরিবেশে তাঁর সেই গাছতলার ইস্কুলের মর্ম কজনই-বা বুঝেছিল সেদিন! তার প্রতিষ্ঠারও কি আর সমালোচনা কম ছিল তখন? কিন্তু তবু, সে-সমালোচনার মধ্যে এ-জাতীয় নীচতা তো ছিল না!

রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কথা মনে এসে যায় অন্য কারণেও। রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁরও পক্ষে তো সহজে সম্ভব হয়নি ইস্কুলটিকে নিজের আদর্শমতো গড়ে তোলার! হিন্দু-সমাজে মুসলমান-সমাজের মতো পর্দা ছিল না ঠিকই, তাই বলে ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়বে মেয়েরা—এ মোটেই সহজে মেনে নেয়নি সমাজ। ইস্কুল-প্রতিষ্ঠার সাতবছর পর মাত্র পাঁচ-সাতটি মেয়ে নিয়ে বালিকাবিভাগ খোলা হলো বটে, কিন্তু দু-বছর পরেই বন্ধ করে দিতে হয় সে-বিভাগ। তারপর বছর দশেক পর আবার চালু হতে পেরেছিল বালিকাবিভাগ।

ব্রিটিশ সরকারের ছাঁচের কোনো শিক্ষাব্যবস্থা চাননি রবীন্দ্রনাথ, রোকেয়াও চাননি পশ্চিমি শিক্ষার হুবহু অনুকরণ, তাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন আমাদের দেশীয় ভাবধারার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইস্কুলের পাঠক্রমের মধ্যে গান-আঁকা-খেলাধুলো—সবকিছুই রাখতে চেয়েছিলেন—যা তখনকার কালের সরকার-স্থাপিত ইস্কুলে সচরাচর থাকত না। রোকেয়াও চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ইস্কুলে গান শেখাবার ব্যবস্থা রাখতে, ব্যায়াম শেখাবার ব্যবস্থা রাখতে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল তীব্র সমালোচনা।

বিদ্যালয়টিকে কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে রোকেয়াকে প্রতিটি আলোচনাকেই রেয়াত করতে হতো। আর তার ফলে তাঁর উপর হুমকিরও কোনো শেষ ছিল না।

প্রতিপক্ষের মোকাবিলা, এ তো গেল রোকেয়ার জীবনপণ সাধনার একটামাত্র দিক। অন্য আরো অনেক দিক আছে। রোকেয়াকে নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে সর্বপ্রথম – ইস্কুল-চালানো কাজটা কেমন – তা বুঝে নিতে হয়েছে। এর জন্যে তিনি ভালো ভালো মেয়ে-স্কুলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে ইস্কুলের কাজের পরিচালনা ব্যাপারটা কী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন, শিখে নিয়েছেন। এই সূত্রে নারী-শিক্ষামহলের প্রধান প্রধান নেতাদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে তাঁর। এত বিস্তৃত পড়াশোনা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাপ না থাকায় ইস্কুল নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় অসুবিধেয় পড়তে হতো তাঁকে। তার জন্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হতে হয়েছিল রোকেয়াকে। আবার কলকাতা থেকে অনেক দূর দূর থেকে ডিগ্রিধারী মেয়েদের নানান যোগাযোগের মাধ্যমে রোকেয়া যাঁদের তাঁর ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিশেবে নিযুক্ত করছিলেন, তাঁদেরও তৈরি করে নিতে হচ্ছিল রোকেয়াকে নিজের মনের মতন করে।

সারা সপ্তাহ ইস্কুলের কাজ করে শনিবার সন্ধ্যায় তিনি পড়তে যেতেন রাজকুমারী দাসের কাছে। অঙ্ক শিখতে যেতেন রেজাউল রহমান খানের কাছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে রোকেয়া তাঁর শিক্ষককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। পড়াশোনার এত আয়োজন

করেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষা তাঁর দেওয়া হয়নি। কী করে হবে? ইস্কুলের কাজের যে শেষ নেই। নিজের জন্য কতটুকু সময় আর দিতে পারেন তিনি! লিখেছেন একটি চিঠিতে:

> চিঠি না লিখিবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝিতে পার খোদার ফজলে পাঁচটা ক্লাস এবং ৭০টি ছোট বড় মেয়ে; দুখানা গাড়ি, দুই জোড়া ঘোড়া, সইস, কোচম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি—সব দিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা সইসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কি না তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে! এই যে হাড়ভাঙ্গা গাধার খাটুনি—ইহার বিনিময় কি জানিস? বিনিময় হচ্ছে—'ভাঁড় লিপকে হাত কালা।' (অর্থাৎ উনন লেপন করলে উনন তো বেশ পরিষ্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে কাল হইয়া যায়।) আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তির অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।

শুধুমাত্র কলকাতার মেয়েরাই নয়, তাঁর ইস্কুলে মফস্বলের মেয়েরাও যাতে পড়তে পারে, তার জন্যে ইস্কুলের সঙ্গে বোর্ডিং-এরও ব্যবস্থা রাখতে চেয়েছিলেন রোকেয়া। পনেরো জন ছাত্রীর দরখাস্ত পেলেই বোর্ডিং খোলা হবে—এই মর্মে রোকেয়া বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছিলেন আঠারো মাস ধরে। তারপর, অন্তত ছ'জন মেয়ের থাকার ব্যবস্থা তৈরি রাখবার জন্যে আরেকটু বড়ো বাড়িতে ইস্কুল উঠিয়ে নিয়ে গেলেন রোকেয়া। লোহার খাট, অন্যান্য দরকারি আসবাবও কিনলেন বেশ খরচ করে। এতসব করার পর ছ'মাস কেটে গেল, কিন্তু মাত্র একজন ছাড়া ছাত্রী এল না। আসবাব কেনার টাকাটাই মাঠে মারা গেল। একটি মেয়ের

জন্যে তো আর বোর্ডিং-এর পুরো ব্যবস্থা বহাল করা সম্ভব নয়, ফলে সেই মেয়েটির সব ভারটুকু গিয়ে পড়ল রোকেয়ারই উপর। ইস্কুলের এত কাজকর্মের মধ্যে একটি আট বছরের মেয়ের থাকা-খাওয়া দেখা-শোনার দায়িত্ব রোকেয়াকে খুবই বিড়ম্বিত করে তুলেছিল। তারপর তাঁর একজন বান্ধবী এসে তাঁর সঙ্গে থাকায়, মেয়েটির দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। এসব হলো ইস্কুল তৈরির গোড়ার দিকের কথা (১৯১৩)। ইস্কুলের যখন বেশ নাম হয়, তখন অবশ্য বোর্ডিং-ও চালু ছিল। রোকেয়ার জীবনের শেষের দিকেব একটি চিঠি থেকে জানতে পারি, তিনি কলকাতার বাইরে গেলে ছোটো বোন হোমায়েরা বোর্ডিং-এর দায়িত্ব নিতেন।

নানান ভাবে, নানান দিক থেকে বাধা আসছিল রোকেয়ার জীবনে। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর সঙ্গে তাঁর মা না থাকলে কলকাতাতে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে তাঁর পক্ষে। কিন্তু ইস্কুল শুরু হবার একবছরের মধ্যেই মারা গেলেন মা। যেদিন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়, পরের দিন ছিল ইস্কুলের এক জরুরি মিটিং। সেক্রেটারি মিটিং-এর কাগজপত্র নিতে এসে মায়ের মৃতদেহ দেখে ফিরে গেলেন। ভাবলেন, হলো না আর মিটিং। কিন্তু পরের দিন ঠিক সময়েই পৌঁছে দিয়েছিলেন রোকেয়া মিটিং-এর সব কাগজপত্র।

মায়ের মৃত্যু রোকেয়ার ব্যক্তিজীবনের দুর্যোগ। দুর্যোগ এল ইস্কুলের জীবনেও। ইস্কুল শুরু হওয়ার মাত্র আট মাস পর বার্মা ব্যাঙ্ক ফেল হলো। ইস্কুলের টাকা গচ্ছিত ছিল ঐ ব্যাঙ্কেই। রোকেয়া তাঁর নিজের টাকা দিয়ে ইস্কুলকে কোনোমতে বাঁচালেন।

কিন্তু তাঁর নিজের সাধ্যই বা কতটুকু? আত্মীয়দের কাছ থেকে মানুষ সাহায্য আশা করে, কিন্তু রোকেয়া ঈশ্বরের কাছে আবেদন করতেন—'আমাকে আত্মীয়দের হাত থেকে বাঁচাও।' ১৯১৪ সালের একটি চিঠিতে রোকেয়া জানাচ্ছেন—তাঁর আত্মীয়রা তাঁর দৈনিক মুখের গ্রাসটুকুও কেড়ে নিতে চাইছে তাঁর কাছ থেকে। তাঁর প্রাপ্য অর্থ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করছে তাঁকে। যদিও আত্মীয়রা জানেন তাঁর কোনো সম্বলই নেই—ইস্কুলের দুটি পদে তিনি রয়েছেন, সুপারিনটেণ্ডেন্ট এবং শিক্ষিকা, কিন্তু কোনো পদের জন্যেই কোনো বেতন নিতেন না তিনি। রোকেয়া চেয়েছিলেন কলকাতার গণ্যমান্য মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে, ভেবেছিলেন তাহলে কলকাতায় প্রতিষ্ঠান করা সহজ হবে তাঁর পক্ষে। কিন্তু তাঁরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন!

এসব সত্ত্বেও ছোট্ট ইস্কুল খুব ধীরে ধীরে একটু একটু করে বড়ো হয়ে উঠছিল। ইস্কুল শুরু হয়েছিল আটজন ছাত্রী নিয়ে, একবছর পরে ছাত্রী-সংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশে। ১৯১৩ সালের মে মাসে বোর্ডিংকে জায়গা দেবার জন্যে ইস্কুলকে নিয়ে আসা হলো ১৩ নম্বর ইওরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে—একটু বড়ো বাড়িতে। ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে ছাত্রীসংখ্যা হলো উনচল্লিশ। ১৯১৫ সালে সত্তরে দাঁড়াল ছাত্রী-সংখ্যা আর আবার বাড়ি বদল হলো ৮৬/এ লোয়ার সারকুলার রোডে, দোতলা একটি বাড়িতে। এই বছর ইস্কুল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। ১৯১৭ সালে বড়োলাটের স্ত্রী লেডি চেম্‌স্‌ফোর্ড ইস্কুল পরিদর্শন করে খুব প্রশংসা

করেন। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল তখন মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়। আরো দশ বছর পর সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত চালু হলো। ১৯৩১ সালে এই ইস্কুলের ছাত্রীরা প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল। ১৯৩২ সালে বাড়ি আবার বদলানো হলো — আরো বেশি জায়গা পাওয়া যাবে বলে। ইস্কুলটি এল ১৬২ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে।

এতরকম বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও ইস্কুলটা যে এইভাবে দাঁড়াতে পারল, তার কারণ রোকেয়া কিছু কিছু বন্ধুও পেয়েছিলেন। একজন বড়ো বন্ধু ইস্কুলের সেক্রেটারি আহমদ সাহেব, যিনি একাধিকবার বাড়িতে প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ শুনেও ইস্কুলের দায়িত্বভার ফেলে রেখে চলে যাননি। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ইনিই ছিলেন রোকেয়ার ডানহাত। প্রতিষ্ঠানের বাইরের অনেক মানুষ রোকেয়াকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কলকাতা থেকে অনেক দূরের মানুষ। ভূপালের এক বেগম পাঠাতেন অর্থসাহায্য, রেঙ্গুনের এক ব্যবসায়ী পাঠাতেন অর্থ-সাহায্য। মুসলমান-সমাজের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল, উদার মনের মানুষ, তাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন ইস্কুলটিকে। আর রোকেয়ার নিজের ত্যাগ তো আছেই। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তিনি নিজের যতটুকু সম্বল বিদ্যালয়ে দান করেছেন। একটি চিঠি থেকে জানতে পারছি, তিনি তাঁর বই পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছেন অর্ধেক দামে — প্রতিষ্ঠানের বাস কেনার টাকার জন্যে! প্রতিষ্ঠানের জন্যে তাঁর পরিশ্রম, তাঁর ত্যাগ কারো কারো কাছে স্বীকৃতিও

পাচ্ছিল। ১৯১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরে রোকেয়াকে লেখা সরোজিনী নাইডুর চিঠিটি যেমন :

> রোগশয্যা থেকে আমি, আপনার অপরিচিত একজন, আপনাকে চিঠি লেখার অনুমতি চাইছি। আজ আমি আপনাকে জানাতে চাই, বিগত কয়েকবছর ধরেই আমি আপনার সাহসী কাজকর্মের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে এসেছি। মুসলমান বালিকাদের শিক্ষা দেবার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে এবং তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে-চলার কাজে আপনার নিষ্ঠা আপনার আত্মদানকে আমি কী গভীর ভাবেই না শ্রদ্ধা করি !...আহা! দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আপনার স্কুলের মতো এইরকম স্কুলের আমাদের যে কি দারুণ প্রয়োজন। এসব স্কুল চালাতে শুধু কি সরকারি সাহায্যই দরকার দেশের ? উন্নতির জন্য যেসব শিক্ষিত সহৃদয়া নারীর প্রাণ কাঁদে, তাঁদের যত্ন আর সাধনার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি !

সরকারি সাহায্য একেবারে যে পায়নি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল, তা নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই কম। ইস্কুলের মেয়েদেব নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ির দরকার, তার জন্যে খবরের কাগজে আবেদন জানানো হলো। প্রথম একটি ঘোড়া উপহার দিলেন এক ব্যবসায়ী। গাড়ির জন্যে এক অভিভাবক দেন ২৫ টাকা, আর সরকার থেকেও মেলে ওই ২৫ টাকাই। এভাবে ইস্কুলের প্রথম ঘোড়ার গাড়িটি হয়, তারপর তার সংখ্যা এক এক করে বাড়তেই থাকে। তারপর ঘোড়ার গাড়ির যুগ গেল, এল মোটরবাস। তখন সে আরেকরকম বিপত্তি !

আপদ আছে জানি আঘাত আছে

সেই বিপত্তির গল্প রোকেয়া নিজেই লিখেছেন তাঁর 'অবরোধ-বাসিনী' বইতে। লেখার শুরুতে দু-লাইন কবিতা তুলে দিয়েছেন তিনি : 'কাব্য উপন্যাস নহে, এ মম জীবন, / নাট্যশালা নহে, ইহা প্রকৃত ভবন!' বড়ো মর্মান্তিক দুঃখেই এ কবিতা তাঁর মনে পড়েছিল!

ইস্কুলের প্রথম মোটরবাসটি তৈরি হয়ে গেছে খবর এসেছে। আগের দিন ইস্কুলের একজন শিক্ষিকা কারখানায় গিয়ে বাসটা দেখে এসে বলেছিলেন মোটরের ভিতর এত অন্ধকার, তিনি কিছুতেই ঐ মোটরে যাবেন না। বাস এলে দেখা গেল বাসের সামনে-পিছনে ওপরের দিকে একটুখানি জাল, ঐ দু-টুকরো জাল না থাকলে বাসটাকে পুরোপুরি এয়ার-টাইট বলা যেতে পারত। সেই অন্ধকার বাসে বাড়ি যেতে গিয়ে মেয়েদের দম বন্ধ হবার জোগাড়! কেউ কেউ বমি করছে, কেউ কেউ-বা অন্ধকারে ভয় পেয়ে কান্নাকাটি জুড়েছে! পরের দিন ছাত্রী আনতে যাবার সময় গাড়ি-পাঠানোর আগে দরজার খড়খড়ি নামিয়ে একটু রঙিন পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু তাতেও বাসের দমবন্ধ অবস্থা দূর হয় না। বাস ফিরে এলে শোনা গেল বাসের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে, কেউ কেউ বমি করেছে, কারো কারো মাথা ধরেছে। বাড়ি ফেরার সময় বাসের দুপাশের খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে, সেখানেও পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হলো।

সেদিন সন্ধ্যায় রোকেয়ার এক বান্ধবী মিসেস মুখার্জি এসে বললেন, ইস্কুলের বাস দেখে তাঁর মনে হয়েছিল একটা আলমারি যাচ্ছে! আর তাঁর ভাইপো তাঁকে বলেছিল—'ও পিসিমা, দেখ-সে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকূপ) যাচ্ছে।'

তিনদিনের দিন মেয়েদের মায়েরা এসে গালমন্দ শুরু করল : 'আপ লাড়কীয়োঁ কো জীতে ভী কবরমে ভর রহি হ্যাঁয়।' রোকেয়া অসহায়ভাবে জানালেন, এ তো তাঁদেরই সন্তোষ বিধানের জন্যে করা, নইলে তো তাঁরাই বলবেন 'বেপর্দা' গাড়ি। মায়েদের উত্তেজিত উত্তর : 'তব্ কেয়া আপ জান মারকে পর্দা করেঙ্গী? কালসে হামারা লাড়কীয়াঁ স্কুলমে নেহী আয়েঙ্গী।' মায়েরা তো বলতেই পারেন, কেননা সেদিনও দু-তিনজন মেয়ে অজ্ঞান হয়েছিল।

কিন্তু এই গালমন্দই সব নয়, উলটো আঘাতও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। যেদিন ছাত্রীদের মায়েরা এসে ঝগড়া করে গেলেন, সেদিনই সন্ধ্যার সময় রোকেয়া চারটি ঠিকানাহীন চিঠি পেলেন, তার মধ্যে একটি ইংরেজিতে লেখা, বাকি তিনটি উর্দুতে। সব চিঠির একটাই বিষয়—'সকলেই দয়া করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ-কামনায় লিখিয়াছেন যে, মোটরের দুই পার্শ্বে যে পর্দা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতাসে উড়িয়া গাড়ী বে-পর্দা করে। যদি আগামী কল্য পর্যন্ত মোটরে ভাল পর্দার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে তাঁহারা ততোধিক দয়া করিয়া 'খবিস' 'পলিদ' প্রভৃতি উর্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করিবেন এবং দেখিয়া লইবেন এরূপ বে-পর্দা গাড়ীতে কি করিয়া মেয়েরা আসে!!' উপাখ্যানের শেষে

রোকেয়া আরো দুটি কবিতার পঙ্‌ক্তি লিখেছেন—

কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে
কেন জন্ম লভিলাম পর্দানশীন ঘরে।

কিন্তু উপাখ্যানে বলেননি রোকেয়া—উর্দু পত্রিকার তিরস্কার থেকে তাঁকে বঞ্চিত হতে হয়নি: 'মিসেস আর এস হোসেন—পর্দা উঠানেকে লিয়ে কোশেস করতা হ্যায়। মুসলমান লেড়কীকো ফিরিঙ্গি মেম বানানেকে এরাদা হ্যায় উস্‌কী, দীন ইসলাম গারৎ হো যাতি হ্যায়, এয়সি কাম বরদাস্ত নেহি হোগা…।'

বোঝা যায়, পর্দাপ্রথা কঠোরভাবে মানা হবে—এ কথাটির উপর ইস্কুলের যে-কোনো আবেদনে এত জোর দেওয়া হতো কেন? রোকেয়া নিজে কি পর্দাপ্রথার পক্ষে ছিলেন? মনে হয় পর্দা বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গি একটু-একটু করে পালটেছে। 'মতিচুর' প্রথম খণ্ডের 'বোরকা' প্রবন্ধটিতে তিনি সরাসরি পর্দাপ্রথাকে সমর্থন করেছেন। বইতে নেই এমন একটি প্রবন্ধ—'নারীপূজা' (মহিলা, পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন ১৩১২)। কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা, সেখানে হিন্দু মেয়ে মুসলমান মেয়েকে বলছে কেন তারা মানে পর্দাপ্রথা, আর উত্তরে মুসলমান মেয়েটি বলে তারা নিজের সুখের থেকে সমাজকে মান্য করে বেশি। কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল রোকেয়ার চিঠির একটি অংশ 'মহিলা'র সম্পাদককে লেখা ('মহিলা', আষাঢ় ১৩১৩)। সে-চিঠিতে রোকেয়া লিখেছিলেন 'পর্দা আমাদের হাড়ে-মাংসে এমন বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহা দূর করিতে গেলে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। অবশ্য

পর্দাত্যাগে আমার নিজের কোন ক্ষতি নাই—ভাবি কেবল পতিত মুসলেম সমাজের জন্য।' এই চিঠিতে এরপর তিনি একটি গল্প বলেছিলেন! হজরত মহম্মদ কোনো যুদ্ধজয়ের পর যাঁদের বন্দী করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রসিদ্ধ হাতেমের বংশের কন্যা; হজরত মহম্মদকে তিনি সেলাম জানালে তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন মহম্মদ, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সঙ্গীদের বন্দী রাখিয়া আমি মুক্তি চাই না! যদি সকলকে মুক্তি দেন, তবে আমিও মুক্ত হইব; নতুবা তাহাদের সঙ্গে চিরবন্দিনী থাকিব।' রোকেয়ারও পর্দামুক্তি সম্বন্ধে তখন এরকমই বক্তব্য ছিল।

কিন্তু ইস্কুল করতে এসে পর্দা নিয়ে তাঁকে এত যে অকারণ হুজ্জত পোয়াতে হলো, তাতেই মনে হয় পর্দাপ্রথার বিড়ম্বনা কতদূর তা ভালো করেই বুঝতে পারলেন রোকেয়া, আর তাই 'অবরোধবাসিনী' (১৯২৮) বইতে একের পর এক বোরকা-পরা মেয়েদের মূর্খতার কথাই শুনিয়ে গেছেন, এ প্রথার অর্থহীনতার দিকে আঙুল দেখাতেই চেয়েছেন। একজন বলেছিলেন পর্দাপ্রথা সমাজের একটা ক্ষত। রোকেয়া প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, ক্ষত থাকলে তো লোকে চ্যাঁচায়, কিন্তু মুসলমান-সমাজের মেয়েরা তো মুখ বুজে আছে! রোকেয়া তাই বলতে চান পর্দাপ্রথা মরণ-হানা গ্যাস—অসাড় করে দিয়েছে মেয়েদের চৈতন্য!

এত কিছু বলা সত্ত্বেও রোকেয়া নিজে কিন্তু কঠোরভাবে পর্দা পালন করতেন। সরকারের এক পদস্থ কর্মচারী, রোকেয়ার

বোনপো, মিঃ গজনভী রোকেয়াকে বলেছিলেন তিনি পর্দা মানলে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেবেন ! এছাড়া অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করবার জন্যেও তাঁর পর্দা মানা ছিল একান্ত জরুরি। একজন স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী মেয়ের পক্ষে এ যে কত বড়ো ত্যাগ ! ইস্কুল কমিটির মিটিং করতেন রোকেয়া পর্দার আড়াল থেকে, ছাত্রীদের খোঁজখবর নিতেন সেও বোরকার অন্তরালে থেকে, মেয়েরা শুধু তাঁর চোখদুটি দেখতে পেত। সচরাচর বাইরের পুরুষদের সামনে তিনি বোরকা পরেও বার হতেন না। এ-বকম একটা বিবরণ দিয়েছেন 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক। রোকেয়া তাঁকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে তিনি চা পেলেন, কিন্তু নিমন্ত্রণকর্ত্রীকে পেলেন না। কিছু পরে পর্দার আড়াল থেকে, পরিচারিকার মধ্যস্থতায় কথাবার্তা হলো। মহিলাদের জন্য বিশেষ 'সওগাত' পত্রিকায় লেখিকাদের ছবি ছাপা হতো, কিন্তু রোকেয়া তাঁর ছবি ছাপারও অনুমতি দেননি, পর্দার খাতিরে। ভাগ্যিস পর্দাপ্রথায় চিঠি লেখার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়নি, তাই পর্দানশিন রোকেয়া অন্তত চিঠির মাধ্যমে নানান মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর ইস্কুলে পর্দাপ্রথা বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সতর্ক থাকলেও খুঁত ধরবার জন্যে যারা তৎপর, তারা ঠিক খুঁত খুঁজে বার করত। বড়ো দুঃখের সঙ্গে তিনি সওগাত-সম্পাদককে বলেছিলেন : 'আমি যে অনিচ্ছাকৃতভাবে অবরোধবাসিনী হয়েছি তার কারণ অনেক। আমার স্কুলটা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি

সমাজের অযৌক্তিক নিয়ম-কানুনগুলিও পালন করছি। অবস্থা এরূপ — এখন যে আমি পর্দার আড়ালে থেকে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, এটাও হয়তো দোষনীয় হয়ে পড়চে। আমি বাড়িতে বাড়িতে ক্যানভাস করে মেয়ে আনতে যাই, কিন্তু অভিভাবকেরা আমাকে আগেই জিজ্ঞেস করেন, পর্দা পালন করা হয় কি না? এতটুকু ছোট মেয়ের বেলায় এই প্রশ্ন! এখন বুঝুন, কি পরিস্থিতির মধ্যে আমি স্কুল চালাচ্ছি, আর ব্যক্তিগতভাবে আমার অবস্থাটাই বা কিরূপ? স্কুলের জন্য আমি সমাজের সব অবিচার, অত্যাচার সহ্য করে চলেছি।'

অত্যাচার কি আর একরকম! ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার দিকে রোকেয়ার দৃষ্টি ছিল সজাগ। ডাক্তার এসে নিয়মিত ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন, তার ব্যবস্থা রাখতে চেয়েছিলেন তিনি স্কুলে। মহিলা ডাক্তার তত বেশি পাওয়া যেত না সে-সময়ে, তাই পুরুষ ডাক্তারেরই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ব্যস্, আর যায় কোথায়! শুরু হয়ে গেল গালমন্দ! রোকেয়া বাধ্য হলেন অনেক খুঁজে পেতে একজন মহিলা ডাক্তার নিয়ে আসতে। তাতেও কি রক্ষে আছে? ডাক্তার যদি কোনো বালিকাকে চিকিৎসার জন্য অভিভাবককে নির্দেশ দেন, তবে সে-অভিভাবক রেগে টং হয়ে যান — মেয়েকে ইস্কুলে দিয়েছেন পড়তে, তাই বলে ইস্কুল তাঁকে এত কিছু করতে বলবে মেয়ের জন্যে : 'স্কুলমে লাড়কী পড়নেকো দিয়া হ্যায়। না বিচার করনেকো, কে, আঁখ-কমজোর, দাঁত কমজোর, হুলকম মে ঘাও হ্যায়, ফেফড়া খারাপ হ্যায়। ইয়ে সব

বলনেসে হামারী লাড়কীকা শাদী ক্যায়সে হোগা? ইয়ে সব বাৎ রহনে দেঁ, হামারী লাড়কীকো ডাক্তারনীসে না দেখায়ে।'

রোকেয়ার আরেক তিক্ত অভিজ্ঞতা ইস্কুলে বাংলা ক্লাস চালু করা নিয়ে। 'দি মুসলমান' পত্রিকায় ১৯১৭ সালে একজন আর. রহমান দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন বাংলার প্রধান শহর কলকাতায় কোনো বাংলা-মাধ্যম স্কুল নেই মুসলমান মেয়েদের জন্যে। এর উত্তরে ঐ কাগজেই রোকেয়া জানিয়েছিলেন তাঁর সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ। কলকাতা শহরে যেসব মুসলমান পরিবারে তিনি যেতেন, সেসব পরিবারের মেয়েরা, যাঁরা উর্দু বলতেন খুব খারাপ, তাঁরাও বাংলায় কথা বলতে রাজি ছিলেন না, বলতেন, বাংলা তাঁরা ভুলে গেছেন! অনেকটা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ইংরেজি কথা বলার মতন! ১৯১১ সালে প্রথম যখন ইস্কুল শুরু হয় তখন ইংরেজি ক্লাসে রোকেয়া ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বলে বোঝাতেন। কিন্তু ছাত্রীদের অভিভাবকরা বলতে লাগলেন, ইংরেজি যেন বোঝানো হয় উর্দু ভাষার মাধ্যমে। অথচ কলকাতা শহরে উর্দু ভাষায় পড়ানোর যোগ্য শিক্ষিকা পাওয়া মুশকিল, উর্দু মাধ্যম বই পাওয়াও সহজ নয়, বাংলামাধ্যম বই-এর তুলনায়, উর্দু ভাষার ম্যাপ, গ্লোব—এসব পাওয়াও কঠিন! কেননা দেশটা বাংলাদেশ! তবু যে রোকেয়াকে উর্দু মাধ্যমের স্কুল বানাতে হয়েছিল—সে নিশ্চয়ই নিজের খেয়ালে নয়।

১৯১৭ সালেই রোকেয়া একটি বাংলা বিভাগ চালু করার চেষ্টা করেন। বাংলাকে মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়

মাত্র দুটি পাঁচ-ছ বছরের বালিকা, আর বাংলাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিশেবে গ্রহণ করে মাত্র আটজন। কয়েক মাস পরেও তার সংখ্যা বারোর বেশি হয়নি। বাংলার ছাত্রী কোনোমতে না বাড়াতে পেরে শেষ পর্যন্ত রোকেয়াকে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল বাংলা বিভাগ ১৯১৯ সালেই। তারও কয়েক বছর পরে রোকেয়া একবার দুঃখ করে বলেছিলেন 'স্থানীয় ভাষা বলিতে অন্য স্থানের ভাষা যাহাই হউক, কলিকাতার ভাষা কি হইবে? ষোলো বৎসর যাবৎ এই সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন— অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই।'

পরের দিকে অবস্থা অবশ্য পালটে ছিল। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালে একটি বাংলা বিভাগ খোলা হোক—অভিভাবকরাই চাইলেন। অন্তত চল্লিশজন ছাত্রীর দরখাস্ত না পেলে রোকেয়া বাংলা বিভাগ খুলবেন না বলেছিলেন, বলেছিলেন অনেক দুঃখময় অতীত অভিজ্ঞতার কারণেই। যাই হোক, ত্রিশ দশকের কিছু আগে খোলা হয়েছিল বাংলা বিভাগ, আর বাংলা মাধ্যমের ছাত্রীরা পরীক্ষায় ভালো ফল করে রোকেয়াকে আনন্দ দিতে পেরেছিল।

তাঁর ইস্কুলের মেয়েদের নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন রোকেয়া। তারা কীভাবে ভালো থাকবে— এই নিয়ে ছিল তাঁর সব সময়ের ভাবনা। একটি মেয়েকে ট্রান্স্ফার সার্টিফিকেট দেবার সময় সেইসঙ্গে তার মাকে লিখেছিলেন: 'মেয়েকে কডলিভার অয়েল খাওয়াতে ত্রুটি যেন না হয়। এখানকার

একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ওকে নিয়মিত কডলিভার অয়েল খাওয়ার কথা বলেছেন।'

ইস্কুলের দৈনন্দিন রুটিনে প্রতিদিন ক্লাস শুরু হবার আগে মেয়েরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াত, আর তিনি দোওয়া পড়তেন, মেয়েরাও তাতে যোগ দিত। তাঁর একটি ছাত্রীর ভাষায়: 'ঐ 'দোওয়া'টি যখন তিনি পড়িতেন তখন মনে হইত যেন তিনি হৃদয় দিয়া আমাদের সেদিনের সাফল্যের জন্য খোদাকে ডাকিতেন। সে যে কি গভীর আন্তরিকতা-ভরা আবেদন তাহা বুকের মধ্যে অনুভব করা যায়—মুখে বলা যায় না।' যখন ছাত্রীরা কোনো পরীক্ষা দেবার জন্যে ইস্কুল থেকে অন্য কোথাও যেত, তখনও তিনি দোওয়া পড়তেন, মেয়েরা তাঁর সঙ্গে দোওয়া পড়তে পড়তে পরীক্ষা দেবার ভয় কাটিয়ে উঠত।

মেয়েদের মঙ্গলকামনা, যা সমাজের মঙ্গলকামনারই আরেক নাম—এরই জন্য তিল তিল করে নিজেকে ক্ষয় করেছেন রোকেয়া। তাঁর ব্যক্তিগত সামান্যতম স্বার্থও এই ইস্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিল না। অথচ তারই জন্যেই প্রতিমুহূর্তে তাঁকে সমালোচনা সইতে হয়েছে। অভিভাবকরা মেয়েকে পড়তে পাঠিয়ে যেন রোকেয়াকেই কৃতার্থ করতেন, আবার কোনো ত্রুটি খুঁজে মেয়েকে স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে যেন রোকেয়াকেই শাস্তি দিতেন। এ স্কুলে যে তাঁর কিছুই জড়িয়ে নেই, একথা রোকেয়া বারবার বলেছেন: 'আপনারা সকলেই জানেন যে, এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটা না থাকলে আমি মরে যাব না।...এই স্কুলটা না থাকলে আমার

তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই?—চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়, চাই স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নয়; চাই, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য।...অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় আমি ভীত হব, কিংবা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এ স্কুল সম্বন্ধে মাথাব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।'

রোকেয়ার আবেদন ব্যর্থ হয়নি, তাঁর ইস্কুল শেষ পর্যন্ত আদর্শ বিদ্যালয়ই হতে পেরেছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর সরকার তার দায়িত্বও নিয়েছিলেন।

ছিন্ন করো রঙিন কুয়াশা

সমাজের কল্যাণের জন্য বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলা রোকেয়ার জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ নিশ্চয়ই, কিন্তু একমাত্র কাজ নয়। মেয়েদের মনকে জাগাতে চেয়েছিলেন রোকেয়া — তারই জন্যে তো ইস্কুল। কিন্তু যারা ইস্কুলে যায় না? বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে যাতায়াতের ফলে কলকাতার উচ্চ-শিক্ষিত মহিলা সমাজের সঙ্গে ভালোই পরিচয় ঘটেছিল রোকেয়ার। তিনি দেখেছিলেন এই মহিলারা, প্রধানত যাঁরা ব্রাহ্ম সমাজের, তাঁরা নানান সমিতি করে নানা ধরণের কাজ করছেন — সখী-সমিতি কিংবা ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল যেমন। রোকেয়া চাইলেন মুসলমান মেয়েদের নিয়েও এমন একটি সমিতি গড়তে।

১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো 'নিখিল-বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি' বা 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিনে-ইসলাম'। সমিতির নামে ঘরের মেয়েদের বাইরে ডেকে আনা — সাধারণ হিন্দু-সমাজেও সে সময় মোটেই সহজ কাজ ছিল না, মুসলমান-সমাজে সে তো আরও অনেক কঠিন — তাদের পর্দাপ্রথা আরো কঠোর বলে। কিন্তু কঠিন বলে হার মানবার মানুষ তো রোকেয়া ছিলেন না। লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যখন তিনি মেয়েদের সমিতিতে আসতে বলতেন, তখন তা নিয়ে কতই না হাসাহাসি হতো প্রথমে। কিন্তু একটু একটু করে বাধা ভাঙল, একটি একটি করে আসতে শুরু করল মেয়েরা। মেয়েদের যে বেরোতে অনিচ্ছা তা তো নয়, আসলে

অভিভাবকদের ভয়েই তারা জড়োসড়ো। রোকেয়া বুদ্ধি দিতেন, আত্মীয়-বাড়ি যাবার নাম করে বেরিয়ে আসতে। সেসব মেয়েরা এতই অজ্ঞ ছিল যে, সভা হয়ে যাবার পর চলে যাচ্ছে যখন সবাই, তখন তারা জিজ্ঞেস করত, কই সভা তো হলো না! সভায় চুপ করে বসে থাকতেও তারা জানত না। সভা হয়ে যাবার পর সভাঘরের দেয়াল পানের পিকের দাগে লাল হয়ে থাকত। তবু এই মেয়েদের উপেক্ষা করেননি রোকেয়া। এদেরই কাছে নারী-সমাজের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, দেশ-বিদেশের নারী আন্দোলনের কথা বলেছেন।

ধীরে ধীরে ছোটো একটা দল তৈরি হলো রোকেয়াকে কেন্দ্র করে। সভা কাকে বলে, সমিতির উদ্দেশ্য কী—মেয়েরা বুঝতে শিখল। কিছুটা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তৈরি করার জন্যে সমিতিতে একটা শিল্পবিভাগও প্রতিষ্ঠিত হলো। দুঃস্থ, অত্যাচারিতা অসহায় মেয়েদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল এই সমিতি। ঘরের মেয়েদের জন্যে শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবু, এই সমিতির কর্মী শামসুন্নাহারের কথায়: 'একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসেবা ও পরোপকারের কথা উল্লেখ করিলে ইহার সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কলিকাতায় মুসলমান নারী সমাজের গত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।'

রোকেয়া যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এই সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা করেছেন, আর তার জন্যে সমিতি থেকে কোনো টাকা-পয়সাও নেননি। মুসলমান মেয়েদের মনের সীমানা বাড়ানো, তাদের নিজের সম্বন্ধে দেশ সম্বন্ধে পৃথিবী সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা—এরই জন্যে তো তাঁর জীবনভর কাজ। কাজ করতে করতে তাঁকে সারাক্ষণই সমালোচনা শুনতে হয়েছে। সমালোচনা শুনে সমিতির একজন বিচলিত হয়েছিল বলে রোকেয়া তাকে বলেছিলেন: 'যদি সমাজের কাজ করতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করে নিতে হবে, যেন নিন্দা-গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুই তাকে আঘাত করতে না পারে।'

'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন'-এর কাজ শুধু মুসলমান মেয়েদের নিয়ে; কিন্তু রোকেয়ার কাজ নিছক সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 'নিখিল ভারত মহিলা সমিতি'রও সদস্য ছিলেন রোকেয়া। তাঁর কলকাতায় বসবাসের বছর তিনেক পরেই দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর অন্যায়ের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কলকাতায় টাউন-হলে সেই আন্দোলনের সমর্থনে একটি সভা হয়, আরেকটি সভা করেছিলেন মহিলারা—বিডন স্ট্রিটে, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনে। কলকাতার বিশিষ্ট মহিলারা সকলেই সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী, ছিলেন ঠাকুরবাড়ির ইন্দিরা দেবী, প্রতিমা দেবী, হেমলতা দেবী, ছিলেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বেগম রোকেয়াও। নিষ্ক্রিয়ভাবে নয়, সক্রিয়ভাবে

উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় যাঁরা যাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁরা হলেন কুমুদিনী মিত্র, প্রিয়ম্বদা দেবী, নলিনী রায় আর বেগম রোকেয়া। রোকেয়ার প্রস্তাবে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন-কারীদের সাহায্যের জন্য প্রতিটি মহিলাসমিতিকে অর্থদান করবার অনুরোধ জানানো হয়।

১৯২০ সালে রোকেয়া দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেন শিশুপালন বিষয়ে—স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনী উপলক্ষে। এও ছিল সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মেয়েদের একটি সভা। শিশুপালনের জন্যে প্রয়োজনীয় অনেক পরামর্শ দেবার পর এ বক্তৃতার শেষেও কিন্তু তিনি শিশু মেয়ের কথা না বলে পারেননি: 'মেয়েদেরও খাওয়া-দাওয়ার একটু যত্ন করবেন। মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা-খরচ করতে হয় বলে বেচারীদের শুকিয়ে মারবেন না।' আর, অবশ্যই, স্ত্রীশিক্ষার কথাও বলতে ভোলেননি, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও বলেছিলেন।

'নারীতীর্থ' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লুৎফর রহমান, ১৯২২ সালে। এই আশ্রমের কার্যনির্বাহক সভার সভাপতি ছিলেন বেগম রোকেয়া। যে মেয়েরা সমাজে লাঞ্ছনা পেয়েছে, সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা ছিল এই আশ্রমের কাজ। এমন কাজের জন্যে রোকেয়া যে সাধ্যমতো সাহায্য করবেন—এ তো খুবই স্বাভাবিক।

১৯২৫ সালে তিনি আমন্ত্রিত হন আলিগড়ে। সেখানকার শিক্ষা কনফারেন্সে রোকেয়া যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, একজন

প্রত্যক্ষদর্শী তার বিবরণ দিচ্ছেন : 'সে বৎসর আলীগড় শিক্ষা কনফারেন্সে মেয়েদের প্রতি অন্যায় অবিচারের জন্য বঙ্গের আতিয়া বেগমের নেতৃত্বে মেয়েরা যে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন, সেদিনও বাংলার মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন এ অপূর্ব মেয়েটি। পুরুষ নেতা ও অসংখ্য জনতার মধ্যে, নির্ভীক পদবিক্ষেপে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া পুরুষের পক্ষপাত ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্তোলন, পরিশেষে নিজের অধিকার ও হক আদায় করিয়া লওয়া কম পৌরুষের কথা নয়।'

এই বক্তৃতার যে খুবই প্রশংসা হয়েছিল, তা বোকেয়ার চিঠির প্রসঙ্গ থেকেও জানতে পারি। কিন্তু মোটে একটা সভা নয়, আলিগড়ে তিনদিন ছিলেন তিনি, তিনদিনই তাঁর নানারকম সভা-সমিতির কাজে কেটে যায়, শহর ঘুরে দেখার সময়টুকু পর্যন্ত হয় না। তাব মধ্যে একটি সভায় মহিলাদে সমিতি সংগঠনের প্রচেষ্টা হয়, সমিতির নাম 'মঈনুন নেসওখাঁ' (নারী জাতির সাহায্যে)। তার জন্যে একজন মহিলা সঙ্গে সঙ্গে হাতের আংটি খুলে দান করেন। মেয়েদের এই সচেতনতা ভালো লেগেছিল রোকেয়ার, আর ভালো লেগেছিল উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের দেখে। তুলনায় বাংলাদেশের মেয়েদের জীবনছবি মনে পড়ে বুক ফেটে গিয়েছিল তাঁর।

১৯২৬ সালে Bengal Women's Educational Conference-এর সভানেত্রী হিশেবে ভাষণ দেন তিনি। তাঁর এই ভাষণ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা-প্রসঙ্গে তাঁর নিজের

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলা। এই ভাষণে মুসলমান মেয়েদের অবরোধপ্রথার বিরোধিতা আর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা এমন তীব্রভাবে বলেছিলেন রোকেয়া যে ভাষণটি তিন-তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটি হলো প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (চৈত্র ১৩৩৩)। প্রমথ চৌধুরী রোকেয়ার একজন গুণগ্রাহী ছিলেন, 'সবুজপত্র'তে রোকেয়ার আরো লেখা দেখতে পেলে আমাদের ভালো লাগত। তবু, একই লেখা যে এতগুলি পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে—এ তো খুব বিরল ঘটনাই। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায়, রোকেয়ার প্রথম লেখা 'পিপাসা' নজরুল ইসলাম তাঁর 'ধূমকেতু' পত্রিকায় আবার ছেপেছিলেন (ভাদ্র ১৩২৯) অনেক পরে, আর 'গৃহ' নামে লেখাটি 'নবনূর'-এ প্রকাশিত হবার মাস তিনেক পরেই পুনর্মুদ্রিত হয় 'অন্তঃপুর' পত্রিকায় (পৌষ ১৩১১)। আর কোনো নারী লেখিকার লেখা এভাবে পুনর্মুদ্রিত হতে দেখিনি। আর ওই অভিভাষণটি তো পুস্তিকা করে বিলি করাও হয়েছিল।

১৯৩১ সালেও আরো একবার তিনি Bengal Women's Educational Conference-এ দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। শিরোনাম : Educational Ideals for the Modern Indian Girl। এই ভাষণে তিনি বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ দেন। শিক্ষা নিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার কথাও তিনি এত ভালো করে জেনেছিলেন। আজকের দিনের ভারতীয় মেয়েদের আধুনিকতার শিক্ষার সঙ্গে

সঙ্গে ভালো মা হবার ভালো স্ত্রী হবার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন। সমাজের সংস্কার যিনি চান, সমাজের বদল নয়, তাঁর চিন্তায় এ-রকম ভাবনাই স্বাভাবিক। এতসব বড়ো বড়ো সভায় সভানেত্রীর সম্মান পেলেও রোকেয়া মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে যে-কোনো সাধারণ সভার আহ্বানও মেনে নিতে দ্বিধা করতেন না। কলকাতা থেকে অনেকদূরে সিউড়িতে একটি বালিকা মক্তবের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভানেত্রী হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়ে সানন্দেই সম্মতি জানিয়েছিলেন তিনি ; আর সেই ছোটো শহরের ছোটো সভাতেও সভানেত্রীর বক্তৃতায় মেয়েদের লেখাপড়ার কথা অবরোধমুক্তির কথা জোরালো ভাষাতেই পেশ করেছিলেন।

এতসব সম্মান যেমন পেয়েছেন রোকেয়া, তেমনি সমালোচনাও তো কম শোনেননি। বাইরের মানুষের অকারণ অপবাদকে তিনি গ্রাহ্য করেননি কোনোদিন। কিন্তু একবার তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমিতিরই মধ্যেকার দলাদলি আর কোনো কোনো সদস্যের ব্যবহারে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন অপরিসীম। মুসলমান মেয়েদের কল্যাণ-ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতি'র সদস্য ছিলেন রোকেয়া। তাঁরই ইচ্ছায় একবার এই সমিতির বার্ষিক সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবার কথা হলো, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিলেন আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন। বাইরের সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে, আর সভাস্থান ঠিক হয়েছিল কাছেই রিপন স্ট্রিটে। সভার নির্ধারিত দিনের আমন্ত্রণ চিঠি বিলি হয়ে গেছে যখন, মাত্র তিন-চার দিন আগে আঞ্জুমানের

সেক্রেটারি হঠাৎ সভার জায়গা বদলে দিলেন, কেননা রিপন স্ট্রিটে যাঁদের বাড়িতে সভা হবার কথা তাঁদের সঙ্গে ছিল তাঁর পারিবারিক মন কষাকষি! আকস্মিক সভাস্থল বদলের খবর ঠিক সময়ে না পেয়ে কম মহিলাই সেই কনফারেন্সে যোগ দিতে পারলেন, আর রোকেয়াও অবশ্যই যাননি সেই নতুন সভাস্থলে। এতেই ফুরোয়নি ব্যাপারটা, তাঁকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে সম্মেলনের জন্যে সংগৃহীত টাকা-পয়সার খরচপত্র নিয়েও! এই একটি ঘটনা প্রমাণ করে নিঃস্বার্থ সমাজসেবা কত কঠিন, আর শুধুমাত্র কর্তব্যপালন করতে গিয়েও মানুষকে কত অকারণ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়।

তাঁর 'অবরোধবাসিনী' বই-এর নিবেদন অংশে রোকেয়া লিখেছিলেন : 'আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।' কিন্তু 'কাঠমোল্লা'দের অভিসম্পাতও তাঁকে ততটা বেঁধেনি, যতটা বিঁধেছে তাঁর প্রিয় বোনেদের অভিযোগ, সমালোচনা। তাঁর ইস্কুল তাঁর আঞ্জুমান— যাদের জন্যে সর্বস্ব দিয়েছেন তিনি—সেসবের হিশেবপত্র নিয়েও তাঁকে কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু সেসব কথা শোনার পরও তাঁর মুখের হাসিটি লেগে থাকত—তাঁর লেখায় বা তাঁর চিঠিতেও যেমন সরসতাটুকু বজায় থাকত সব সময়।

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ

কিন্তু হাসির আড়ালে লুকোনো দুঃখ তাঁর শরীরে ছাপ রেখে যেত অবশ্যই। নিজের কোনো কষ্টে কাতরতা প্রকাশ করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। শরীর যতই দুর্বল লাগুক, রোজকার কাজ ঠিক-ঠিক করে গেছেন তিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানতে পারছি, দু-মাস ধরে জ্বরে ভুগছেন তিনি, এত দুর্বল লাগে যে খাতা-কলম দেখলে ভয় করে, বই পর্যন্ত পড়তে পারেন না। তবু স্কুলে ক্লাস নিয়ে চলেছেন এই দুর্বলতা নিয়েই।

এই অসুস্থতার খবরের সঙ্গে সঙ্গেই রোকেয়া জানান তাঁর একাকিত্বের কথা, তাঁর আত্মীয়দের কৃতঘ্নতার কথা। যখন তাঁর অর্থের এত প্রয়োজন, তখনো তাঁর আত্মীয়রা তাঁকে প্রতারণা করেছেন, আর্থিক ক্ষতির থেকেও বড়ো ক্ষতি আত্মীয়দের বিষয়ে মনের এই তিক্ততা! আশ্চর্য নয়, শরীর তাঁর খারাপ হয়েই চলবে। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের চিঠিতে আবার তাঁর অসুস্থতার খবর পাই।

তাঁর ইস্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা, হাজাররকম কাজ, লেখা —এসবের চাপ তো আছেই, এ ছাড়াও কোনো কোনো ঘটনা মনে হয় তাঁকে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করছিল। ১৯২৬-এর কলকাতার দাঙ্গা বিষয়ে তিনি যে বিশেষ কিছুই লেখেননি, এতে একটু অবাকই লাগে। চিঠিতে শুধু জানিয়েছিলেন, ইস্কুলের ছাত্রী

কমে গেছে আর কাজকর্মের জন্যে পরিচারক পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর মতো মানুষ, যাঁর প্রায় প্রতিটি রচনায় হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁর মনে দেশের মধ্যে ক্রমাগত বেড়ে-ওঠা সাম্প্রদায়িকতা কি কোথাও কোনো আঘাত হানছিল না ?

১৯৩০-৩১-এ এল নিদারুণ মৃত্যুশোক—ফুল ফোটার আগেই ঝরে যাওয়ার শোক। ১৯৩০-এর বকর-ঈদের সময় সোলতান নামে তাঁর 'নয়ন-পুতলি' এক বালকের মৃত্যু হয়, তার একবছর বাদে চলে যায় বারো বছরের বালিকা নূরী—তাঁর বোন হোমায়েরার একমাত্র মেয়ে, সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালের ছাত্রী। এই নূরীকেই রোকেয়া নিজের মনের মতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চিরজীবন যিনি দুঃখী, যিনি বাবার আদর পাননি, স্বামী চলে গেছেন কম বয়সে, কন্যাসন্তানেরা বাঁচেনি, তাঁকে নূরী আর কত কাঁদাবে—চিঠিতে একথা লিখেছিলেন বটে রোকেয়া, কিন্তু তারপর তাঁর শরীর আর ভালো হয়নি। নূরীর মৃত্যুব চার-মাস পরে একটি চিঠিতে লিখছেন, তাঁর আরো একবার প্রবল জ্বর হয়েছিল, তখনো ইনজেকশন চলছে, শরীর খুবই দুর্বল। দিন সাত-আট পরের একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, তাঁর পেটের অসুখ, কিডনির গোলমাল, আর দাঁত অধিকাংশই তুলে ফেলতে হয়েছে। অথচ তখন তাঁর বার্ধক্যের বয়স মোটেই নয়, মাত্র একান্ন বছর।

কলকাতায় থাকলেই তখন অসুস্থ বোধ করছেন রোকেয়া, পারলেই ঘাটশিলা চলে যাবার চেষ্টা করছেন। ঘাটশিলার

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যখন মন ভরে ওঠে, তখনো কিন্তু রোকেয়া ভুলতে পারেন না ইস্কুলের দায়-দায়িত্বের কথা, হাজাররকম কাজের কথা। তাই একটানা ঘাটশিলায় বেশিদিন থাকতেও পারেন না। ২৫ সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় এসে অক্টোবরেই আবার কলকাতায় যেতে হয়, সেখান থেকে ইস্কুলের কাগজপত্র নিয়ে রওনা হতে হয় জলপাইগুড়ি। ৮ নভেম্বর আবার ফিরে আসেন ঘাটশিলায়। ঘাটশিলায় হেঁটে বেড়াতে খুব ভালোবাসেন তিনি, ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে লেখেন : 'এখন এখানে বেড়াইবার বড় আরাম। ধান কাটা হইয়াছে, সেই সব ক্ষেতের নরম খড়ের উপর হাঁটিতে কি মজা। প্রাণ ভরিয়া হাঁটিয়া বেড়াই।'

কিন্তু শরীর ঘাটশিলায় থাকলেও মন তো থাকে কলকাতায়। ২৯ তারিখে গোছগাছ শুরু করে ৩০ ডিসেম্বরই তাঁকে ফিরে আসতে হয় কলকাতা।

সম্ভবত আর তাঁর ঘাটশিলা যাওয়া হয়নি। অথচ মৃত্যুর মাত্র কদিন আগে তাঁর ঘনিষ্ঠ একজনকে তিনি বলেছিলেন : 'আমি তো চললাম ···আমি কি চিরটাকাল এই ভূতের বোঝা বহে মরব ? এবার আমার ছুটি নেবার পালা। আমার জন্যে একটা 'হোজরা' তৈরি হচ্ছে। বাকি কটা দিন আমি সেখানেই অজ্ঞাতবাস করব।' সেই 'হোজরা'টি ছিল ঘাটশিলায় তাঁর নতুন বাড়ি।

সত্যিই কি পারতেন তিনি, তাঁর ইস্কুল ছেড়ে সমিতি ছেড়ে বিশ্রামসুখে দিন কাটাতে ?—সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তাঁর এক বন্ধু, চিঠিতে : 'পারিবেন কি আপনি স্কুলের সংস্রব ত্যাগ করিতে ?

মৎস্য যদি জলাশয় না হইলে একদণ্ড টিকিতে না পারে, আপনিই বা স্কুলের আবেষ্টনের মধ্যে না হইলে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন?’

হ্যাঁ, খুবই ঠিক লিখেছিলেন সেই বন্ধু! বিশ্রাম-সুখ আর পাওয়া হয়নি রোকেয়ার। জীবনের শেষ রাত্রিটি পর্যন্ত বহুক্ষণ ইস্কুলের ফাইল দেখেছেন তিনি। আর টেবিলের ওপর যে অসমাপ্ত লেখাটি ছিল, সমাজ-শাসনের মৌচাকে সে এক ঢিল—মুসলমানের বিবাহ-পদ্ধতিতে যদি মেয়েদের অনুমতি লাগে, তবে তালাকের সময়ে কেন মেয়েরা অনুমতি দেবে না—লেখাটিতে এই ছিল রোকেয়ার প্রশ্ন, যথারীতি ব্যঙ্গের সরসতা মাখানো!

লেখাটি কি সে-রাত্রেই লিখতে শুরু করেছিলেন রোকেয়া? তা আর জানা যায়নি। পরের দিন, ১৯৩২-এর সেও এক ৯ ডিসেম্বর—রোকেয়ার জন্মদিন—খুব ভোরে উঠে নামাজ পড়ার জন্য ওজু করার পরই অসুস্থ বোধ করেন তিনি। খুব অল্প সময়ের অসুস্থতা, তার পর মৃত্যু। না, কারো সেবা নেননি রোকেয়া—আত্মনির্ভরশীলা এই মেয়েটি নিজের জোরেই বেঁচে ছিলেন, চলেও গেলেন নিজের জোরে!

আরো দশটা বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন রোকেয়া, চেয়েছিলেন তাঁর ইস্কুলের একটি নিজস্ব বাড়ি দেখে যেতে, নিজের পায়ে তার দাঁড়ানো দেখে যেতে। পরে একদিন তাঁর আশা পূরণ হয়েছিল। শুধু, তা দেখে রোকেয়ার আনন্দ-পাওয়া আর হয়ে উঠল না!

—